Contents

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ হতে নিষেধ

শাইখুল ইসলাম

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.)
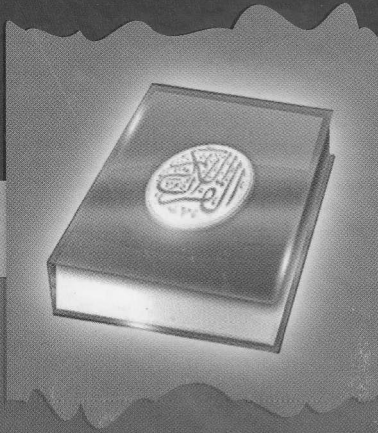
সম্পাদনায়

আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ

আল্লামা 'আলীমুদ্দীন একাডেমী

Contents

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ হতে নিষেধ

মূল ঃ

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ্ (রহ.)

অনুবাদ ঃ

আবূ সালমান মুহাম্মাদ ইসহাক

(লিসান্স, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা, সউদী আরব)

সম্পাদনা ঃ

আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ

'আল্লামা 'আলীমুদ্দীন একাডেমী

প্রকাশক ঃ
আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ
২৫৭, পশ্চিম ধানমণ্ডি
রোড নং- ১৯ (পুরাতন), ঢাকা-১২০৯

প্রাপ্তিস্থান ঃ
'আল্লামা 'আলীমুদ্দীন একাডেমী
৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০,
ফোন ও ফ্যাক্স ঃ ০০৮৮-০২-৮১২৫৮৮৮
মোবাঃ ০১৭১২-৮৮৯৯৮০, ০১৭২৬-৬৪৪০৬৭

প্রথম প্রকাশ ঃ
অগাস্ট ২০১০ ঈসায়ী

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
ইউনিক কম্পিউটার্স
৮৯/৩, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল,
ঢাকা-১১০০, মোবাঃ ০১১৯৯-৫৬৭৩৭০

কভার ডিজাইন ঃ
নাসির ভাই
মোবাইল ঃ ০১৭২০-৯১১২৬৫

মূল্য ঃ ১৫০/= টাকা মাত্র (অফসেট)

The Rights of **Sot Kajer Adesh O Osot Kajer Nisedh** By Shaikhul Islam Imam Ibne Taimiah (Rh.) & Published by Abu Abdullah Muhammad, Phone & Fax: 0088-02-8125888, Mobile: 01712-889980, 01715-035107

Contents
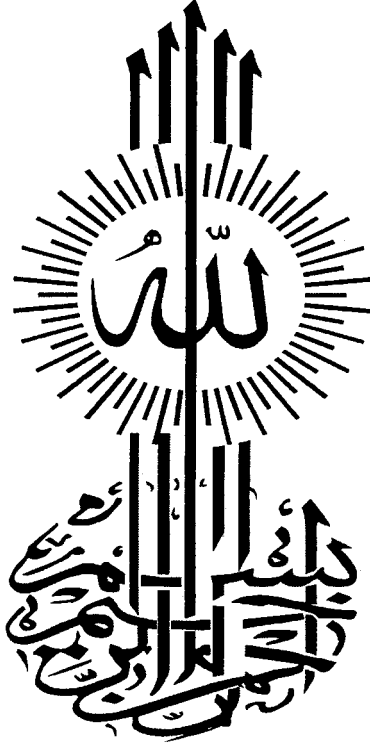
﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُوْنَ﴾

"তোমরা সর্বোৎকৃষ্ট জাতি, যাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করবে এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করবে। আর যদি আহলে কিতাবগণ বিশ্বাস স্থাপন করত, তাহলে সেটা তাদের জন্য অত্যধিক মঙ্গল হতো, তাদের মধ্যে বিশ্বাসী লোকও (কিছু) রয়েছে আর তাদের অধিকাংশরা ফাসিক।" (সূরা আ-লি 'ইমরান ৩ : ১১০)

উৎসর্গ

দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম রিজালশাস্ত্রবিদ আল্লামা আবূ মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন (রহ.)-এর প্রতি উৎসর্গিত হলো। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাঁকে জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করুন। আমীন।

এবং

নেক 'আমালের খাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকুক সে আমাদের প্রিয় দীনী ভাই আলহাজ্জ ফকীর মনিরুজ্জামান। দীনের প্রকাশ ও প্রচারে যার অবদান চির স্মরণীয়। মহান ও মহীয়ান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাঁকে উভয় জগতে অফুরন্ত কল্যাণ দান করুন। সুম্মা আমীন॥

আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নিবেদন

প্রশংসা জগৎসমূহের একমাত্র প্রতিপালক মহান ও মহীয়ান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য নিবেদিত। আমরা একমাত্র শুধু তাঁরই 'ইবাদাত করি আর তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। হিদায়াতের একমাত্র উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় আলোকবর্তিকা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি দরূদ ও সালাম।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেন ঃ

﴿وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ﴾

"তোমাদের ইলাহ (উপাস্য) একজনই ইলাহ, তিনি ছাড়া কোনই (সত্য) ইলাহ নেই, তিনি অসীম করুণাময়, পরম দয়াশীল।"

(সূরা আল-বাকারাহ্ ২ ঃ ১৬৩)

মহান ও মহীয়ান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেন ঃ

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ .... بَعِيْدًا﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল, তিনি যে কিতাব তাঁর রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন তাতে এবং যে কিতাব তিনি পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন তাতে ঈমান আন এবং কেউ আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং আখিরাতকে প্রত্যাখ্যান করলে সে তো ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে।" (সূরা আন্-নিসা ৪ ঃ ১৩৬)

পৃথিবীর বুকে যে সকল মনীষী এ ক্ষণস্থায়ী জগৎ সংসারকে আলোকিত করেছেন, কুসংস্কার, শির্ক ও বিদ'আতের ঘুনে ধরা সমাজ ব্যবস্থায় ব্যাপক ও কালজয়ী সংস্কার সাধন করেছেন শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) তাদের মধ্যে (৬৬১-৭২৮ হিঃ) অন্যতম। বরং এ কথা বলা যায়, যুগে যুগে যে সব সংস্কারক এসেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠত্বের আসনে শাইখুল ইসলাম এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হয়ে পৃথিবীর বুকে আজও আলো বিকীরণ করে চলেছেন।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন এমন এক সময় এই জগৎ সংসারে তাঁর জন্ম দিয়েছিলেন যে, জাতি তখন মাযহাবী কোন্দল, তাতারীদের যুলুম-অত্যাচারে জর্জরিত ও নিষ্পেষিত, আর নামধারী ফকীহদের দুনিয়ার প্রতি অত্যধিক মোহ ও ক্ষমতার চক্রকে চিরস্থায়ীভাবে ধরে রাখার হীন অপপ্রয়াস জাতিকে এ সময় ক্রমাগতভাবে এক অন্ধকারে নিমজ্জিত করছিল।

তৎকালীন মুসলিম জাতি রাজনৈতিক পতনের সাথে সাথে ধর্মের দিক দিয়ে অধঃপতনের প্রান্তসীমায় উপনীত হয়েছিল। দলাদলি আর মাযহাবী কোন্দলে জরাজীর্ণ হয়ে ৭৩টি দলের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ঘটেছিল। নিজেদের মধ্যে এই অনৈক্যের কারণেই তাতারীরা মুসলিমদের ধ্বংস সাধনের প্রক্রিয়ার সব সুযোগ গ্রহণ করেছিল। আর তৎকালীন আলিম সম্প্রদায় ও তাদের হিংসা-বিদ্বেষের কারণে জাতীয় সত্তা ও চিন্তা-চেতনা বিকাশের দ্বার রুদ্ধ হয়েছিল। পীর-পূজা, কবর পূজা ও অন্ধ কুসংস্কার সর্বত্র সদম্ভে বিরাজ করছিল।

কুরআন ও সহীহ হাদীসের সরল পথ পরিত্যাগ করে জাতি এক অন্ধকারাচ্ছন্ন পথেই ছিল ধাবমান। মিথ্যা, জাল হাদীস ও ভণ্ড দরবেশ এবং ফিকাহ্‌বিদদের দিকভ্রান্ত পথনির্দেশের কারণে জাতি তখন হাবুডুবু খাচ্ছিল। তাকলীদ বা অন্ধ অনুসরণ জাতির স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণা আর বিকাশমান

ইসলামী চেতনোবোধকে স্থবির করে রেখেছিল। ফলে মুসলিম জাতির চরিত্র ও মনোবল নিম্নস্তর হতে নিম্নস্তরে পৌঁছেছিল। আর দীনের প্রকৃত রূপ ও ঈমানের প্রকৃত স্বাদ হতে বঞ্চিত হয়ে জাতি ক্রমশঃ তখন পিছনের স্তরে উপনীত হয়েছিল।

উল্লেখ্য যে, শাইখুল ইসলাম প্রায়শঃ এ কথা বলতেন ঃ

আমি আহমাদ (রহ.)-এর মাযহাবের আহ্বায়ক নই, আমি ঐ কথার আহ্বায়ক যা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত। বিশেষ করে সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত তারই আহ্বায়ক।
(মাজমুআ আল-ফাতাওয়া ঃ ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২০৩)

৬১৬ হিজরী থেকে শুরু করে দীর্ঘ ৪০ বছর তাতারীদের নির্মম অত্যাচারে এ জাতি তখন নিষ্পেষিত। আর এদের হাতেই বাগদাদ নগরীর চূড়ান্তভাবে ধ্বংস সাধন সম্পূর্ণ হয়েছিল। সেদিন মুসলিমদের রক্তের স্রোত বাগদাদের রাস্তায় রাস্তায় আর অলিতে গলিতে প্রবাহিত হয়েছিল।

নিষ্ঠুর ও নির্মমভাবে তাতারীদের এ অত্যাচারে একের পর এক মুসলিম রাজ্যসমূহ তছনছ হয়েছিল। আর এ সময় তাতারীদের উপস্থিতি মুসলিম জগতে এক ভয়াবহ আতঙ্ক হিসেবে বিরাজ করছিল। আর এর একমাত্র কারণ ছিল নিজেদের মধ্যে কোন্দল, পরস্পর পরস্পরের প্রতি ভয়ানক হিংসা ও বিদ্বেষ আর অনৈক্য। সত্যিকার অর্থে কুরআন ও হাদীসের প্রতি মানুষের অনীহা আর ফিকহী মাসআলার প্রতি ছিল এক অন্ধ অনুরাগ বা মোহ। প্রকৃত অর্থে এ সময় ইসলাম ছিল অবরুদ্ধ। আর এই সব কারণেই আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন মুসলিম জাতির প্রতি হয়ত রুষ্ট হয়েছিলেন। আর পরিণামে জাতি এ সময় ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ধ্বংসের শেষপ্রান্তে পৌঁছেছিল।

ইসলামের শাশ্বত সহজ সরল গতিপথে তৎকালীন দিক নির্দেশকরা সৃষ্টি করেছিল নানা রকম গোলক ধাঁধাঁ। তাদের অভিযান ছিল গোটা জাতির বিরুদ্ধে। এহেন যুগসন্ধিক্ষণে এ সব বাতিল শক্তির মুকাবিলায় অসি

ও মসি হাতে একাই বীরত্বের মহিমা নিয়ে সুদৃঢ়চিত্তে পতাকা উত্তোলন করে দণ্ডায়মান হয়েছিলেন তাওহীদ ও ইসলামী আকায়িদের মহান ব্যাখ্যাদাতা, দর্শনশাস্ত্রের গোলক ধাঁধাঁর জাল ছিন্নকারী এক আপোষহীন বিপ্লবী সৈনিক শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.)।

ইসলামের আঙ্গিণায় পুঞ্জীভূত আবর্জনা মুক্ত করাই ছিল তাঁর একমাত্র ব্রত ও লক্ষ্য এবং সাধনা। দেশাচার ও লোকপ্রিয় ইসলামকে সত্যিকার ইসলামের কষ্টিপাথরে যাচাই করতে তিনি ছিলেন নিরলস এক সংগ্রামী। তাওহীদের অগ্নিমন্ত্রে প্রদীপ্ত হৃদয়ের আলোকে দার্শনিক ও ফকীহদের কূট তর্কজাল ছিন্ন করতে তিনি ছিলেন অকুতোভয় অগ্রাভিযাত্রী এক অজেয় সৈনিক। পরাজিত শত্রুরা তার কণ্ঠ রোধ করার জন্য লৌহকপাটে অন্তরীণ রেখেও তাকে কোনদিন পরাভূত করতে পারেনি। তিনি কারান্তরালে বসেও সগৌরবে ঘোষণা করেছেন তাওহীদের অমিয় বাণী। ধরেছেন মসির তলোয়ার। কেড়ে নেয়া হয়েছে কাগজ। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে তাঁর কলম। অবশেষে লোহার গরাদ দেয়া বন্ধ ঘরে তাঁর প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। রাজশক্তির প্রতিনিধিগণ কক্ষে প্রবেশ করে অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করেন ঘরের সমস্ত দেয়ালে উৎকীর্ণ, ইমামের কয়লা দিয়ে লেখা বাণী।

জেলের বাইরে থাকাকালীন সময়ে ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী বিভিন্ন কার্যকলাপ, রীতিনীতিসমূহ বন্ধ করে ইসলামের আসল বা প্রকৃত সুন্নাহ প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন সতত তৎপর এক নির্ভীক সংস্কারক। তার জীবন বৃত্তান্ত ও সংস্কারকীর্তি সম্পর্কে অবগতি আর কুসংস্কার দূরীকরণের উপকরণ হিসেবে আমাদের জীবনে এ গ্রন্থ ব্যাপক কাজে লাগবে। সে সাথে অকৃত্রিম বিষয়ের যৌক্তিকতার সাথে প্রমাণিত হবে কৃত্রিম বিষয় ও প্রচলিত প্রথা রেওয়াজের অসারতা। সন্দিগ্ধ ব্যক্তিদের অনুমানভিত্তিক- সন্দেহ দূর হয়ে সমগ্র জীবন ব্যবস্থার স্বরূপ উদঘাটিত হবে। এটা নিঃসন্দেহে হবে একটি ইসলামী জিহাদের সমতুল্য। কেননা গলৎ বিষয়ের মূল উৎস অবগত হওয়া না গেলে তা' থেকে বিরত থাকার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা যায় না।

সুতরাং তাওহীদ ও শির্ক, সুন্নাত ও বিদ'আত এবং আসল ও নকল বস্তুর মধ্যে তারতম্য করা তখনই সম্ভব হবে যখন এগুলোর মূল উৎস, উদ্দেশ্য ও পরিণাম সম্পর্কে সঠিক তথ্য অবহিত হওয়া সম্ভব হবে।

অতঃপর এ কথা অপরিহার্য যে, ইবনে তাইমিয়াহ্ (রহ.) তাঁর ব্যক্তি জীবন চরিত, স্বীয় কর্ম-পদ্ধতি, অগাধ জ্ঞান এবং অঢেল প্রমাণ-প্রবাহ দ্বারা সর্বক্ষণ ঐ সকল সমস্যাসমূহ নিরসন করেন যা মুসলিম মন-মানসকে সদা-সর্বদাই ব্যস্ত ও অনুপ্রাণিত রাখে এবং যা তার (মুসলিম) আচার-অনুষ্ঠান ও আত্মাকে পবিত্র করার সাথেও সম্পৃক্ত।

তাঁর [ইবনে তাইমিয়াহ্ (রহ.)] সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ হতে নিষেধের বক্তব্য সেটার উচ্চমর্যাদা সম্পর্কে তাঁর অনুধাবন, পূর্ণ জ্ঞান ও অনুভূতি হতে উৎসারিত। ইসলামী সঠিক জ্ঞানবোধের চেতনা সৃষ্টির মধ্যেই সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ হতে নিষেধের মূল্য নিহিত রয়েছে, যা ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ সংশোধনে ব্যাপক কাজ করবে, সকল অন্যায়-অনাচার, অবৈধ ও অশ্লীলতার উপকরণাদি হতে দূরে রেখে এ জগতের মহান ও মহীয়ান স্রষ্টার সাথে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক সুদৃঢ় করবে।

এ (সৎকাজের আদেশ করা ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করা) সে ভিত্তি, যার উপর আসমানী শারী'আতসমূহ প্রতিষ্ঠিত। ইসলাম ও তার ভিত্তিসমূহ মজবুতকরণে, মানব-সমাজ গঠনে, সেটার মঙ্গল ও কল্যাণ বিধানসহ কার্যক্রম সুপ্রতিষ্ঠার মূলভিত্তি হিসেবে গ্রহণে সেটাকে পাথেয় করে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে। মানব জীবন সেটার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত করা হয়েছে, যেন এ গ্রন্থের মাধ্যমে ঈমান, আল্লাহভীতি এবং হিদায়াতের ভিত্তিতে স্বকীয়তা প্রমাণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে পারে।

এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিতে ইবনে তাইমিয়াহ্ (রহ.)-এর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও জীবনাদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি অবশ্যই পরস্পর সুদৃঢ় বন্ধনে

মজবুত, শক্তিশালী একক জাতি গঠনে উন্নত পদ্ধতি ও আদর্শ নীতি উপস্থাপন করেছেন। যে জাতি সত্যের অন্বেষণে তৎপর হবে, তা সে সত্য যেখানে ও যেভাবেই থাকুক না কেন এবং স্পষ্ট বক্তব্য ও বলিষ্ঠ যুক্তি প্রমাণ দ্বারা বাতিলকে প্রতিহত করবে। তিনিই হবেন ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ্ (রহ.)-এর যোগ্যতম উত্তরসূরী।

সেহেতু এ জাতি হল উত্তম জাতি। কেননা পৃথিবীর বুকে এটা তো উদ্ধারকারী জাতি। যার হাতে এ বিশ্বের শক্তি, নিরাপত্তা ও শান্তিরক্ষার গুরুদায়িত্ব অর্পিত। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন প্রকারের ভ্রান্ত আকীদাহ্ ও পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়গুলোর স্বরূপ উন্মোচন, সত্যকে পরিস্ফূটন ও বিশদভাবে সেটার বিবরণ প্রদানে পথনির্দেশিকার ও আলোকদিশারী হিসেবে কাজ করবে।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আমাদের সরল-সঠিক দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন। প্রকৃতঅর্থে হক দীন অনুভব করে মুসলিম জাতির ঐক্য ও অগ্রগতির লক্ষ্যে পৃথিবীর বুকে উত্তম জাতি হিসেবে আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবার জন্য রাব্বুল 'আলামীনের নিকট তাওফীক কামনা করছি।

হে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন! তোমার অগ্রবর্তী দলের সঙ্গে আমাদেরকে সম্পৃক্ত করো। আর এ অবস্থায় ঈমানের সঙ্গে মৃত্যু নসীব করো। আমীন! সুম্মা আমীন॥

অগাস্ট ২০১০ ইং — আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ

সূচীপত্র

Contents

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা শুধু তাঁর প্রশংসা করছি এবং তাঁর সাহায্য চাচ্ছি। আর আমাদের অসৎকাজসমূহ ও নিজেদের প্রবৃত্তির কলুষতা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে পথপ্রদর্শন করেন, তাকে বিপথগামী করার কেউ নেই।

আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে পথপ্রদর্শন করারও কেউ নেই। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই এবং আমরা আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা এবং তাঁর প্রেরিত পুরুষ (রাসূল)।

হে আল্লাহ! তাঁর উপর শান্তি, অনুগ্রহ ও বারাকাত অবতীর্ণ করুন এবং তাঁদের উপর যাঁরা তাঁর আহ্বান মুতাবিক আহ্বান করেন এবং তাঁরই সুন্নাতের উপর কাজ করেন– আমীন॥

নিশ্চয়ই আল্লাহ যে সকল বিষয় দ্বারা ইসলামী উম্মাহ্কে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন, সেটার একটি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে পুনরুত্থানের দিন পূর্ববর্তী সকল উম্মাহ্র জন্য সাক্ষী বানিয়েছেন। কেননা মুসলিম উম্মাহ্ দা'ওয়াতের এমন একটি গুরু-দায়িত্ব বহন করেছেন, যা সকল সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করাকে শামিল করে থাকে। এ কাজ আমার জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এবং নবূওয়াতীর উত্তরাধিকারের অন্তর্ভূক্ত। কেননা নিশ্চয়ই সকল নাবীগণের দা'ওয়াত হল সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করা। আর এটা হতে প্রতীয়মান হয় যে, এ মুসলিম উম্মাহ্র 'আলিমগণ বানী ইসরাঈলের নাবীগণের মত। কেননা

তাঁরা অন্য সকল উম্মাহ্‌র প্রতি তাঁদের উপর বর্তিত আদেশ ও নিষেধ, উপদেশ এবং পথ প্রদর্শনের গুরু-দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল শাসক বা শাসিত এ উভয় বিষয় তাঁদের স্কন্ধে অর্পিত স্বীয় সমাজের প্রতি পালনীয় দায়িত্বের বাস্তব অনুভূতি প্রসূত। শাসিতের কথা বলার পূর্বে (তথা আলোচনার পূর্বে) শাসকের তার সমাজের প্রতি দায়িত্ব ও আমানতদারীর অনুভূতি ও বক্তব্যের গুরুত্বের উপর জোর দিচ্ছি। যখন জ্ঞানী ব্যক্তি সততা ও অনাবিল অন্তরে উপদেশ দিবেন, আর শাসক সেটা সততা, নম্রতা ও আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করবেন তখন কেবল প্রজা সাধারণের সকল বিষয় সুষ্ঠু ও সুন্দর হবে। কারণ শাসক ও পণ্ডিতবর্গ কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের অধিকারী। তাই যখন জ্ঞানীব্যক্তি তার উপদেশ দানে সৎ হবেন এবং শাসক সেটার বাস্তবায়নে আন্তরিকতাপূর্ণ হবেন ও তার দায়িত্ব পালনে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের বাস্তবায়নে কঠোর পরিশ্রমী হবেন, তখন জাতির জন্য ভাগ্য উন্নয়ন সম্ভব হবে এবং সেটার অবস্থাও সুন্দর হবে। জাতির প্রতিটি সদস্য তার অধিকার, সম্মান, ইয্‌যত-আবরুর নিরাপত্তা নিশ্চিন্ত হবে। সেটা ব্যতীত জাতির কর্মকাণ্ড তথা সার্বিক বিষয়েরও কোন সুরাহা হবে না। সেটা হবে তখন, যখন 'আলিম ও শাসকগণ শান্তি ও যুদ্ধের কর্ণধার হবেন এবং স্থির সিদ্ধান্তের অধিকারী, ক্ষমতাশীল ও জাতির মস্তিষ্ক হিসেবে কাজ করবেন। এ মর্মে কুরআন ও হাদীসের বহু উক্তি রয়েছে, যা মুসলিমগণকে দুষ্কৃতিকারী 'আলিম ও অত্যাচারী শাসকের আপদ হতে সতর্ক করছে।

কুরআন ও হাদীসের বহু উক্তি আছে, যা বিস্তারিতভাবে জ্ঞানীজনের করণীয় কাজ ও শাসকের দায়িত্ব এবং সমাজ সংশোধন কিংবা সেটার বিনাশের ক্ষেত্রে উভয়ের বক্তব্যের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করছে। এখানে আমি জ্ঞানীজনের প্রয়োজনীয়তা এবং জাতির অবস্থার সংশোধনে তার ভূমিকার সুদীর্ঘ বর্ণনা দান করতে চায় না। অনুরূপভাবে শাসকেরও না। কেননা এ ক্ষেত্রে বিষয়টি এত সুস্পষ্ট যে, বেশী ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। আসলে যা

আমাকে এ কথাগুলোর দিকে আহ্বান করেছে, সেটা ইসলামী উম্মাহ্‌র বর্তমান অবস্থা, যেমন– অনুন্নতি, অধঃপতন ও দুর্বলতা আর এক শ্রেণীর 'আলিমের স্ব-স্ব দায়িত্ব নিয়ে জাগরণের অভাব এবং দায়িত্বপূর্ণ কাজের ঝুঁকি, যা তারা নিয়েছিল– সেটা হতে দূরে সরে থাকা। এটা ছাড়াও এক শ্রেণীর শাসকদের একচ্ছত্রতা, তাদের যুল্‌ম, সীমালঙ্ঘন, জাতির ভবিষ্যৎ ও সেটার ইতিহাস নিয়ে তাদের স্বেচ্ছাচারিতা এবং সেটার শত্রুদের পক্ষে বেহায়াপনা কর্মকাণ্ড উল্লেখযোগ্য। এসব ঘটমান সত্য যার মধ্যে সমকালীন মুসলিমগণ দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত করছে এবং সেটার কঠোর তিক্ত স্বাদও প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় হাঁড়ে হাঁড়ে অনুভব করছে। আর ইসলামের অবস্থা সেটার অধিকাংশ দেশগুলোতে এমন দাঁড়িয়েছে, যেমন– কোন এক কবি বলেছেন–

"যেভাবে তাকাবে ইসলামের দিকে
যে কোন দেশে,
সেভাবে পাবে তাকে সেথায়
কর্তিত ডানা পাখীর বেশে।"

সমাজ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি এবং জাতি ও সেটার (শুভ-অশুভ) পরিণতি সম্পর্কে কোন ব্যক্তির অনুভূতি না থাকা বা একেবারেই সেটা অনুপস্থিত থাকা, যে কারণে বিষয়টি আরও বেশী ভয়াবহ হয়েছে সেটা এই যে, কিছু লোকের মুখে এ বক্তব্যটি সামাজিক কপটতা ও রাজনৈতিকভাবে বিক্রয়ের বাজারে ব্যবসায়ের পণ্য স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবস্থা এমন হয়েছে যে, সেটা যে কোন ব্যবহারিক পণ্যের ন্যায় বেচা-কেনা হচ্ছে আর হাতে পাওয়া মাত্র সেটা মূল্যহীন হয়ে পড়ছে। আর ঠিক এটার কুফল আজকালকার যুব সমাজের অন্তরে বিদ্যমান, সেটা তাদের অনেকের মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হচ্ছে এবং এটা হতে প্রত্যেকটি বিষয়ে যা বলা হতে পারে ও

যারা বলেন, তাদের মধ্যে কখনও কখনও বিশ্বস্ততার অভাব সৃষ্টি হচ্ছে যা, উক্ত বিষয়টিকে গুরুত্বহীনতা বা পায়ে ঠেলা অবস্থার দিকে– যে অবস্থায় আজ যুব-সমাজের কিছু অংশ রয়েছে বা ক্রমাগত তাদের নিয়ে যাচ্ছে। প্রকৃত প্রস্তাবে এটা একটি জাতি বা গোষ্ঠী যা, ব্যাধি দ্বারা সংক্রামিত হয়ে থাকে– তার চাইতেও বেশী ভয়ঙ্কর আর সেটা হল– জাতির ভবিষ্যৎ গঠনের কাজে অংশগ্রহণ করা হতে সেটার সন্তানদের দূরে থাকা এবং জাতির অবশ্য করণীয় কাজের দায়িত্বানুভূতিহীন হয়ে পড়া।

প্রত্যেকটি জাতির (এমনই কিছু বিষয় আছে) প্রয়োজনে যারা আদেশ করবে ও যা হতে নিষেধ করবে। যেমনভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির এবং সে যার আদেশ করবে এবং যা হতে নিষেধ করবে– চায় সেটা তার অন্তরে সম্পাদিত হোক আর না-ই হোক সে সেটার আদেশ করবে, এবং (অন্য দিকে) নিষেধও করবে অথবা তার নিজের মধ্যে এবং অপরের মধ্যে .... (সেটা সম্পাদিত হোক আর না-ই হোক সে সেটার আদেশ ও নিষেধ করবে)। এরূপ ছাড়া মানুষ বা সমাজের অবস্থা কল্পনা করা যায় না। আর যখন কোন জাতির নিকট– যার সে আদেশ দিবে ও যা হতে নিষেধ করবে, এটা না থাকে, তখন সেটা সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রেরিত মহাপুরুষগণকে এবং বিশ্বাসীগণকে যা ('র আদেশ) দিয়েছেন সেটাকেও তারই আদেশ দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ (তিনি পবিত্র) ইরশাদ করেছেন ঃ

"হে বিশ্বাসীগণ! আমরা তোমাদেরকে যে রিয্ক দান করেছি সেটা হতে পবিত্র, ভালগুলো আহার কর এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।"

আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রেরিত পুরুষগণকে বলেছেন ঃ "হে প্রেরিত পুরুষগণ! উত্তম বস্তু হতে আহার কর এবং সৎকাজ কর।" আর এ সম্প্রদায়ের উপর রাসূলগণ যার আদেশ করেছেন এবং যা হতে নিষেধ করেছেন তার আদেশ করা ও নিষেধ করা অবশ্য করণীয় করেছেন।

অতঃপর মহামহিম পবিত্র আল্লাহ বলেছেন ঃ "তোমাদের মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায় হওয়া উচিত, যারা ভালোর দিকে আহ্বান করবে, সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজ হতে নিষেধ করবে।"

এ আদেশ ও নিষেধের গুরুদায়িত্ব পালনের মাধ্যমে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এ জাতির স্থান ও স্থানীয়মান নির্ণয় করেছেন।

মহান ও মহীয়ান আল্লাহ বলেছেন ঃ **"তোমরা হচ্ছো উত্তম জাতি, যাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজ হতে নিষেধ করবে।"**

অনুরূপভাবে এ দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনীয়তার উপর নাবী ﷺ-এর পবিত্র বাণী সেটার প্রমাণ বহন করছে।

নাবী ﷺ বলেছেন ঃ "তোমাদের কেউ যদি কোন অসৎকাজ হতে দেখে তবে সে যেন সেটা তার হাত (শক্তি) দ্বারা প্রতিহত করে, যদি সে তা না পারে, তবে সে যেন সেটাকে অন্তরে অন্তরে ঘৃণা করে, আর ওটা হচ্ছে সবচাইতে দুর্বল ঈমানের কাজ।"

সহীহ হাদীসে এসেছে, "তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজ হতে নিষেধ করবে, অন্যথায় তোমাদের পাপের কারণে আল্লাহ তোমাদের উপর (শাস্তি স্বরূপ) অত্যাচারী শাসক চাপিয়ে দিবেন, তখন তোমরা দু'আ করবে অথচ সেটা গৃহীত হবে না।"

যেমন– আল-কুরআনুল মাজীদ বর্ণনা দিচ্ছে যে, বানী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের পতন এবং আল্লাহর অনুগ্রহ হতে দূরে সরিয়ে দেয়ার কারণসমূহের মধ্যে এটাও একটা অন্যতম প্রধান কারণ ছিল যে, তারা যে অসৎকাজ করত। কিন্তু সেটা হতে নিজেরা বিরত থাকত না। বরং দুষ্কর্ম তাদের কাছে সামাজিক প্রথা এবং হীন ও নীচু পর্যায়ের কর্মকাণ্ড তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল।

আল-কুরআনুল কারীমে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের কাহিনী এজন্য এসেছে, যাতে তাদের ঘটনা হতে ইসলামী উম্মাহ্ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এবং বিশ্বাসের জ্ঞান অর্জন করতে পারে যে, যদি উপকরণাদি* পাওয়া যায় তবে আল্লাহর সৃষ্টি জগতে তাঁর বিধানের** পরিবর্তন হয় না।

সামাজিক ব্যাধি হতে সমাজকে সুস্থ রাখার কামনায় এ গুরুদায়িত্ব পালন করাটা মুসলিমগণের উপর ওয়াজিব-ই-কিফায়াহ্,*** যা (পালন না করার দরুন) পূর্ববর্তী উম্মাহ্সমূহকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। অতএব ইসলামী উম্মাহ্র ঐ দায়িত্ব পালনে কোনরূপ অবহেলা বা গড়িমসি করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আর যদি এ দায়িত্ব পালনে কেউ এগিয়ে না আসে, তাহলে এজন্য সম্মিলিতভাবে সকলে অপরাধী হবে এবং এ উম্মাহ্র উপর সেটাই বর্তাবে, যা পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উপর বর্তিয়েছিল।

যখন প্রত্যেক জাতিরই কোনও না কোন বিষয়ে আদেশ করতে ও নিষেধ করতে হয়; তখন আল্লাহ্ তা'আলা যে বিষয়ে আদেশ ও নিষেধ করার জন্য পবিত্র গ্রন্থে উম্মাহ্র উদ্দেশে আদেশসমূহ ও নিষেধাবলী স্বয়ং নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং নাবী ﷺ-এর পবিত্র সুন্নাহ্ তথা হাদীস ও সেটার পদ্ধতিসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। আর এখান থেকেই প্রতীয়মান হল যে, আল্লাহ্ যা আদেশ করেছেন এবং যা হতে নিষেধ করেছেন, সেটা ব্যতীত অন্য কিছুর আদেশ করা বা নিষেধ করা কারও জন্য বৈধ হবে না।

সুতরাং এ বিষয়টা যে ব্যক্তি আদেশ করবেন বা নিষেধ করবেন, তার নিকট এ দাবীই করে যে, তিনি যেন সূক্ষ্মজ্ঞানী হন এবং আল্লাহর

---

* অর্থাৎ– ইসলামী চরিত্র।

** অর্থাৎ– "আল্লাহ্ তা'আলা কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যদি না ঐ জাতি নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন না করে।" (সূরা রা'দ)

*** ওয়াজিব-ই-কিফাইয়াহ- যা কোন এলাকার একজন বা একদলে আদায় করলে অন্য সকলের পক্ষ হতে আদায় হয়ে যায়। যেমন– জানাযার নামায।

আদেশাবলী ও নিষেধাবলী সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় জ্ঞানে অবহিত হন, যাতে তিনি বুদ্ধি অথবা রুচি, স্বাদ বা প্রবৃত্তিকেই তার আদেশাবলী ও নিষেধসমূহের উৎসস্থল ধরে না নেন এবং মানুষকে অজ্ঞানতাবশতঃ সৎপথ হতে বিভ্রান্ত না করেন, যে বিষয়ে মনের ধারণা প্রবল হবে যে, এটা শারী'আতের আদেশাবলীরই অন্তর্ভুক্ত, সে বিষয়ে আদেশ দেয়াও যথেষ্ট (হিতকর) হবে না; কেননা মনের ধারণা আদেশের বেলায় দৃঢ় বিশ্বাসের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে না, যদিও সেটা বেশী নিরাপদ ও বেশী পরিব্যপ্ত গণ্য করে নিষেধের বেলায় তা হতে পারে। এটাতে অবশ্যই প্রতীয়মান হবে যে, কোন বিষয়ে আদেশ দেয়া যদিও সেটা সর্বজন পরিচিত বিষয়, সে আদেশ যেন ঐ বিষয়টিকে সেটার খারাপের দিকে ঠেলে নিয়ে না যায় অথবা এমন কোন অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সৃষ্টি না করে, যা জাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে ঐক্যে ফাঁটল ধরতে পারে এবং কোন এমন বিষয় হতে নিষেধ না করা, যা ঐ অন্যায় বিষয়টির চাইতেও বড় কোন ক্ষতিকর কিছুর দিকে নিয়ে যায়। কেননা কোনও উপকার সাধনের চেয়ে কোনও অপকার রোধ করাই শ্রেয় ও অগ্রগণ্য।

আদেশ দানকারীর কাছে আদেশ দানের স্থান, কাল, পাত্র ও পরিবেশসমূহের যেথায় আদেশ দান করা প্রয়োজন হবে, সে সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অবশ্যই থাকতে হবে এবং কখন কিভাবে আদেশ দিবে .... (?) তাও তার জানতে হবে। কেননা পরিবেশ ও স্থান এবং অবস্থা ভেদে দৃষ্টিভঙ্গি ও উপকরণের অবস্থা অনুযায়ী পার্থক্য হয়ে থাকে। অতএব যা এমন যুগে গ্রহণ ও ব্যবহার প্রয়োজন সেটাই অন্য সময়ে অপ্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায়। আবার এটাও জানতে হবে যে, দু'টি ক্ষতিকর বিষয়কে প্রতিহত করতে যেয়ে বৃহত্তর কল্যাণ সাধনের ইচ্ছায় অপেক্ষাকৃত ছোট ক্ষতিকর বিষয়টি বরণ করে নেয়া বৈধ, যদি না এটা ব্যতীত উক্ত বিষয়ে আদেশ করা সম্ভব হয়। এটা আদেশদাতার কাছে এ দাবী করে যে, তিনি যেন (আল্লাহর) আদেশসমূহের ও নিষেধাবলীর কারণসমূহ এবং সেটার উপকরণগুলো

ভালভাবে জ্ঞাত হন। যাতে তিনি (নিছক) আদেশ ও নিষেধের জন্য পরিমিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদেশ না দেন এবং নিষেধও না করেন। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহর পথে আহ্বানকারীগণ ও মুসলিমগণের সমস্যাদি নিয়ে যারা মাথা ঘামান তাদের এদিকে অবশ্যই দৃষ্টিপাত করা উচিত, যাতে তারা তাদের পদসমূহের সঠিক বা ভুল অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত ও সচেতন হতে পারেন।

এটা ছাড়াও আরও অন্যবিধ বিষয় আছে, যা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ হতে মানুষকে নিষেধকারীদের জন্য ঐসব বিষয়ে স্পষ্ট অবগতি থাকা বাঞ্ছনীয়। ইসলামী সূক্ষ্মজ্ঞানের অধিকারী হওয়া এবং যে বিষয়ে আদেশ দিবে ও নিষেধ করবে সেটা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকার সাথে সাথে তাকে মানুষের কষ্ট সহ্য করার ব্যাপারে অত্যন্ত ধৈর্যশীল হতে হবে। তাদের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণকারী হতে হবে, সহনশীল ও সত্যের জন্য সৎসাহসী হতে হবে, তার সেটা ছাড়া কোন ক্রমেই চলবে না।

কেননা আল্লাহর পথে আহ্বানকারীকে মানুষের দেয়া অনেক কষ্টের সম্মুখীন হওয়া ছাড়া উপায় নেই। আর এটা এমনই বিষয় যে, এটা ছাড়া তার গত্যন্তরও নেই। তাই তার উক্ত অত্যাচার ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনা নিজের অন্তরে সহ্য করার অভ্যাস করা উচিত। কেননা এমন কোন প্রেরিত নাবী অথবা কোন সংস্কারক ছিলেন না যিনি কোনও মতবাদ বা দা'ওয়াতের পতাকা উত্তোলন করে জান-মাল ও পারিবারিক দিক হতে অনেক দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হননি। যখন তার ধৈর্যের পোষাক না হবে, যা দ্বারা সে সজ্জিত হবে তখন যে জন্য নিজেকে নিয়োজিত করেছে সে উদ্দেশ্যই সাধন করতে পারবে না, বরং এমন ক্ষতির দিকেই নিয়ে যাবে যার অপকার মুসলিমগণের জন্য তার উপকারের চেয়েও অনেক বেশী।

অনুরূপভাবে সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎকাজ হতে নিষেধের সময় তাকে মানুষের সাথে বন্ধুসুলভ, নম্র, দয়ার্দ্র ও সহনশীল হতে হবে।

কেননা নম্রতাও মানুষকে আহ্বানের জন্য অপরিহার্য বিষয়ের অন্তর্গত, যাতে আমরা আদেশ ও নিষেধের আসল উদ্দেশ্য লাভ করতে পারি। আল্লাহ হচ্ছেন রাফিক বা বন্ধু, তাই তার সকল কাজে বন্ধুসুলভ নম্রতা পাওয়া যাবে, ঐ গুণটি তখনই সেটাকে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য দান করবে। আর যখনই কোন বিষয় হতে নম্রতাকে ছিনিয়ে নেয়া হবে, তখনই সেটাকে অসুন্দর করে ফেলবে।

এটা আল্লাহ তা'আলার কথারই বাস্তবায়নে যথা– "সুন্দর উপদেশ ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর এবং যে দলীল-প্রমাণগুলো সবচেয়ে উত্তম সেটা দ্বারা তাদের সাথে যুক্তিপূর্ণ বাকতর্ক কর।" যে ব্যক্তি মানুষকে আদেশ করা ও নিষেধ করার সম্মুখীন হবেন, তার জন্য এ বিষয়গুলো যথা– ফিকহ্ তথা সূক্ষ্মজ্ঞান, ধৈর্য, সহনশীলতা, নম্রতা ও বন্ধুসুলভ আচরণের প্রয়োজনীয়তার উপর শাইখুল ইসলাম (রহ.) বেশী গুরুত্বারোপ করেছেন। অনুরূপভাবে সত্যের ব্যাপারে সাহসিকতা ও তার জন্য অত্যাবশ্যক, যেন আদেশ ও নিষেধ তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে।

এখানে কিন্তু প্রয়োজনীয় সাহসিকতা, ক্ষমতা ও বীরত্ব বলতে শারীরিক শক্তি অথবা পেশীর শক্তি নয়, বরং সেটা হচ্ছে অন্তরের সাহস ও সামরিক ঘাঁটি। ঐ শক্তির উৎস হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর উপর বিশ্বাসের দৃঢ়তা এবং সেটাতে বিশ্বাসের তথা দৃঢ় বিশ্বাস রাখা। আমরা দেখেছি এমন বহু লোক রয়েছে, যাদেরকে শারীরিক গঠনের দিক হতে খুবই শক্তিশালী বলে মনে হয়, অথচ অন্তরের দিক হতে তারা খুবই দুর্বল। তাদেরকে পলায়ন করার ব্যাপারে প্রথম সারির লোক হিসেবে দেখতে পাবে, অথচ আক্রমণ করা, সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া ও সাহসী বীরদের কর্মক্ষেত্রে তাদেরকে দেখতে পাবে সকলের শেষের সারিতে। এখানে আল্লাহর পথে আহ্বানকারীর জন্য তার অন্তরের সাহসিকতাই মৌলিক প্রয়োজনীয় বিষয়। কেননা সেটা সে শক্তি যা, তাকে সীমালঙ্ঘনকারী ও অত্যাচারীর প্রতি এ

কথা নির্ভীকভাবে নির্দ্বিধায় বলতে অনুপ্রেরণা দান করবে যে, থামো! সেটা (যুল্‌ম-অত্যাচার, সীমালঙ্ঘন) করো না। আর সেটা এমন এক শক্তি যা তাকে শক্তিশালী ও পর-স্বার্থ হরণকারীকে এ কথা বলতে প্রস্তুত করবে যে, দুর্বলের প্রাপ্য (যথাযথভাবে) দিয়ে দাও এবং আল্লাহর বান্দাহ্‌দের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তাদের হক নিয়ে আর ছিনিমিনি খেলো না এবং সেটাতো সে শক্তি যা তার বক্তব্যকে তার নির্ভেজাল নিয়্যাত ও সততা হতে প্রকাশ করবে এবং সেটা কোনরূপ বানোয়াট, রঙিন বা মুনাফিকী তথা কপটতাও হবে না। এটা কোন ব্যবসা ভিত্তিকও হবে না। এমনকি ঐ বক্তব্য তার অন্তরাত্মা হতে বের হয়ে আসবে, যাতে সেটা মুসলিম জাতির অন্তরে স্থায়ীভাবে অবস্থান নিতে পারে; অতঃপর তাকে যেন দুনিয়া ও আখিরাতের যেরূপ কল্যাণ ইচ্ছা সেরূপ কল্যাণের দিকেই সুপরিচালিত করতে পারে।

আল্লাহর পথে আহ্বানকারী মুসলিম ব্যক্তির জন্য আজ যে পুস্তকখানা উপহার দিব, সেটা পূর্বপুরুষদের পর্যায়ক্রমিক উত্তরাধিকার, যা দশ বৎসর পূর্বেই প্রকাশ করতে শুরু করেছি, যেন তাতে ঐ সকল মৌলিক বিষয়ের স্পষ্ট নিদর্শনাবলী– আমাদের বর্তমান যুগে আমরা যার খুব বেশী অভাবী– সুন্দররূপে তা ফুটিয়ে তুলতে পারি।

বিশেষ করে সৎপথ চ্যুত চিন্তাধারা, অশ্লীল সমাজ ব্যবস্থা, বেপরোয়া রাজনৈতিক স্রোত গড্ডালিকা প্রবাহের ন্যায় বইতে শুরু করার পর হতে যা যুবসমাজের নির্মল বিবেক বুদ্ধি নিয়ে অহেতুক তামাশা করছে এবং তাদের সামনে সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্যরূপে সাজিয়ে তুলে ধরছে।

এ সময় "সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ হতে নিষেধ" শীর্ষক পুস্তকখানা এমন কাজসমূহের একটি ধরা হবে, যাকে বর্তমান যুগের একজন মুসলিম তার ব্যধিস্থলে এবং তার রোগ লুকিয়ে থাকার স্থানে এবং জাতির পীড়ার কারণ (উৎস) স্থানে স্থাপন করবে এবং সেটা তার এ

রোগের উপযোগী প্রতিষেধক হিসেবে বর্ণনা করবে, যা তার জন্য ঐ ব্যাধির মূলোৎপাটক হবে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ্ (রহ.)-এর আগে ও পরে বহু মুহাদ্দিস, ফকীহ্ ও তর্কবিদগণ এ বিষয়টি নিয়ে কিতাবখানা সংক্ষিপ্ত কথা ও উল্লেখিত বিষয়ের প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত বহনকারী। কখনও কখনও আহ্বানকারীর দোষত্রুটিকে ঔজ্জ্বল্যমান করে তুলে ধরতে সক্ষম, আবার কখনও বা কি কি গুণে গুণান্বিত হতে হবে তার দিশা দানকারী এবং পরিবেশ ও বাধা বিপত্তির ব্যাখ্যা দান করতঃ আহ্বানকারীর পদ্ধতি ও ভূমিকায় কি কি পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন তারও ব্যাখ্যা দান করে থাকে। এ পুস্তকখানা পর্যায়ক্রমিক সালাফী উত্তরাধিকারের 'আল-মাখ্তুতাত' প্রথম ভাগের তৃতীয় পুস্তক। সেটার পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে ঃ

১। দাকায়িকু–আল–তাফসীর আল–জামিউ লি তাফসীর–ই শাইখ আল-ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ্, চার খণ্ডে সমাপ্ত, সেটার দু'টি সংস্করণ বের হয়েছে।

২। কিতাবুত্ তাওহীদ ওয়া ইখ্লাসুল ওয়াজহি ওয়াল 'আমালি লিল্লাহ। সেটার দু'টি সংস্করণ বের হয়েছে এবং সেটার দ্বিতীয় খণ্ডের (পাঠ ও গবেষণা) বের হয়েছে।

৩। আল-ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ্ তা'ওয়ীল এর বিষয়ে তার ভূমিকা।

৪। সালাফী মতবাদে বিশ্বাসের ভিত্তিসমূহ।

ইতোপূর্বে এ পুস্তকখানা তার আগে 'মাজমু'আত শাজ্বারাতিল বালাত্বীন' এর সাথে যা আল-শাইখ আল-মরহুম মুহাম্মাদ হা-মি আল-ফাকী সংগ্রহ করেছেন। অনুরূপভাবে সর্বশেষে 'আল-মাকতাবাতুল কাইয়্যিমার' মালিক (আল-কাইমিয়াহ লাইব্রেরীর মালিক) কায়রোতে সেটা ছাপিয়ে ছিলেন। যারা এ দু'টি মুদ্রণের বেলায় পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন এবং প্রশংসারযোগ্য শ্রম দিয়েছেন, তাদের উক্ত ত্যাগ আমরা স্বীকার করছি এবং দু'আও করছি যেন তাদের নির্ভেজাল-খালিস 'আমালসমূহ (আল্লাহর কাছে)

গৃহীত হয়। অথচ এ কথাটিকে সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক ভঙ্গিমায় বাস্তবায়নের প্রয়োজন স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে, বিশেষ করে পূর্ববর্তী সংস্করণগুলোতে কোন কোন স্থানে কিছু ভুলভ্রান্তি বের হয়েছে, যা তাইমিয়াহ্‌র বক্তব্যের অর্থে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। ইতোপূর্বে আমরা সেটার স্থানানুযায়ী ঐদিকে ইঙ্গিত করেছি। যেমন সেটার সর্বশেষ সংস্করণটির প্রতি সেটার মালিক কোনই গুরুত্ব দেননি, যার কারণে হাদীসসমূহ বের করার ব্যাপারে টিকাকারগণের ব্যবহৃত চিহ্নের কারণে সেটা দুর্বোধ্য হয়ে এসেছিল, যা সনদধারী ও সহীহ হাদীস গ্রন্থকারদের উদ্ধৃতি ব্যতিরেকে হাদীসের শব্দসূচী– অভিধান হতে সংগ্রহ করেছে। আর এতে পাঠকের মেধার পক্ষে অস্বস্তিকর বিষয় হয়ে রয়েছে, যা তাকে হয়তো বা অবসাদের দিকে ডেকে নিয়ে যাবে।

বর্তমান সংস্করণে ঐসব দোষত্রুটির গোটাটাই সংশোধন করে দেয়া হয়েছে। এখানে জেদ্দাস্থ 'দারুল মুজ্‌তামা' লাইব্রেরীর মালিক ভাই 'আবদুর রহমানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করে আর পারছি না, যিনি আমাদেরকে এ বর্ণনার মূল্যায়নের ও বাস্তবায়নের জন্য সেটাকে পুনঃ মুদ্রণের প্রস্তাব রেখেছিলেন এবং পাঠক সমাজে এ বইখানার বহুল প্রচার-প্রচলনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের দিকে তাকিয়ে এটার প্রতি তার বিশেষ যত্ন ও প্রশংসনীয় ভূমিকা দেখিয়েছিলেন।

অতএব আল্লাহ যেন তাকে উত্তম প্রতিফল দান করেন, তাদের ও আমাদের নেক 'আমালসমূহ কবূল করেন এবং সেটাকে শুধু তাঁরই পুতঃ পবিত্র সত্তার জন্য নির্দিষ্ট করে নেন, সেটা দ্বারা ইসলাম ও মুসলিমদের সার্বিক কল্যাণ সাধন করেন।

আল্লাহ যেন তাঁর বান্দা ও প্রেরিত পুরুষ মুহাম্মদ ﷺ ও তদীয় বংশধর এবং সাহাবাদের উপর বারাকাত, রাহমাত ও দয়ার বারি বর্ষণ করেন।

ড. মুহাম্মাদ আস-সাইয়্যিদ আল-জালিন্দ

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ্ (রহ.) নেতা ও ইতিহাস

তাঁর প্রতিপালন ও কর্মময় জীবন ঃ

তিনি আল-ইমাম তাকীউদ্দীন আবুল 'আব্বাস আহ্‌মাদ বিন 'আবদিল হালীম আল-ইমাম মাজদুদ্দীন আবিল বারাকাত আবদুস সালাম বিন আবি মুহাম্মাদ বিন 'আবদিল্লাহ্ বিন আবিল কাসীম মুহাম্মাদ বিন আল-খাদির বিন আল-খাদির বিন 'আলী বিন 'আবদিল্লাহ্ বিন তাইমিয়াহ্ আল-হাররানী। তিনি ৬৬১ হিজরীর ১০ই রবিউল আউয়াল, রোজ সোমবার, মুতাবিক ইংরেজী ১২৬৩ সন ২২শে জানুয়ারী হাররানে জন্মগ্রহণ করেন। ৬৬৭ হিজরী মুতাবিক ১২৬৮ খৃঃ যখন দুর্ধর্ষ তাতার বাহিনী ইসলামী দেশসমূহের উপর আক্রমণ করে, তখন তাঁর পিতা তাঁকে নিয়ে দামেস্কে তাঁর পরিবারের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করেন। তিনি কেবলমাত্র তখন উঠতি বয়সের বালক মাত্র। তিনি তখন শৈশবে মাত্র। তখনও তিনি তাঁর জীবনের সাতটি বৎসরও অতিক্রম করেননি। সেই ছোট বেলা থেকেই জ্ঞান ও জ্ঞানীগণকে ভালবেসেই তিনি বড় হয়েছেন। জ্ঞানীদের সাথে উঠা-বসা ও জ্ঞান-চর্চা ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ের প্রতি কখনও তিনি অগ্রসর হননি। তাঁর পিতা ছিলেন হাদীসশাস্ত্র ও তৎসংশ্লিষ্ট জ্ঞানের ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য ও অসাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তি এবং এটাই ইবনে তাইমিয়াহ্‌কে হাদীসশাস্ত্র ও তদসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে গবেষণায় ব্যস্ত থাকতে আগ্রহী করে তুলেছিল।

দামেস্কে গমনের সাথে সাথেই তাঁর সুনাম চতুর্দিকে প্রচারিত হয়ে পড়ে এবং তাঁর প্রশংসাপূর্ণ কর্মকাণ্ড ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করে। তখনই দামেস্কের মাসজিদে তাঁর পাঠ দানের একটি হালকা বা বৈঠক বসত। 'দারুস্ সুক্‌রিয়া' যেখানে তিনি স্থায়ীভাবে বাস করতেন, হাদীসশাস্ত্রের পণ্ডিতগণের জ্ঞানানুশীলনের স্থানগুলোর মধ্যে সেটিই ছিল শীর্ষস্থানীয়, যা

ইবনে তাইমিয়াহ্‌কে তাঁর শৈশবে স্নেহের কোলে তুলে নিয়েছিল, তিনি এটার দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

(ইবনে কাসীর, আল-বিদায়াহ্ ওয়া আন্‌-নিহায়াহ, ১৩-৩০৮ পৃষ্ঠা)

শিশুকালেই তিনি আল-কুরআনুল মাজীদ মুখস্থ করেন। এটার পর তিনি হাদীস, ফিক্‌হ, উসূল ও 'ইল্‌মী কালাম তথা তর্কবিদ্যা শিক্ষার দিকে মনোনিবেশ করলেন। বহু ফকীহ্ এবং হাদীস বিশারদগণের নিকট হতে পাঠ শ্রবণ করেছেন এবং তাঁদের সামনে পড়ে তা শুনিয়েছেন। তাঁদের জ্ঞান ভাণ্ডার হতে সংগ্রহ করেছেন। তাঁদের সকলের সাথেই যুক্তিপূর্ণ তর্ক প্রতিযোগিতা করেছেন অথচ তখনও তিনি অল্প বয়সের ছেলে মানুষ মাত্র।

তিনি যখনই মক্তবে যেতে চাইতেন তখনই একজন ইয়াহূদী তাঁর যাত্রায় বাধ সাধতো। ঐ ইয়াহূদীর বাড়ী ইবনে তাইমিয়াহ্‌র পথের ধারেই ছিল। সে ইবনে তাইমিয়াহ্‌র শৈশব হতে যে মেধাবী ও ভদ্র অভ্যাস সম্বন্ধে জানতে পেরেছিল সে সকল বিষয়ে তাঁকে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করত। আর ইবনে তাইমিয়াহ্ ঝট্‌পট সেটার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জবাব দিতেন। এতে ঐ ইয়াহূদী খুবই আশ্চর্য হতো। অতঃপর শাইখ যে আদর্শের উপর আছেন। তাতে সন্দেহ জন্মাবার হীন উদ্দেশে ইয়াহূদী একই ঘটনা পুনঃ পুনঃ ঘটায়। কিন্তু সেটা তাঁর 'আকীদাহ্ দীনের উপর অবিচলতা ভিন্ন আর কিছুই বর্ধিত করতে পারেনি। এরূপ ঘটনার পর উক্ত ইয়াহূদী আর কাল বিলম্ব না করে অকপটে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছিল। (আল-আ'লাম আল-আলিয়্যাহ ফী মানকির-ই ইবনে তাইমিয়াহ্, বায্‌যার ১৮-১৯ পৃষ্ঠা)

তাঁর মেধাশক্তি, স্মৃতিশক্তি এবং দ্রুত উপলব্ধি ক্ষমতায় সমগ্র দামেস্কবাসী অবাক হয়ে গিয়েছিল। তাঁর সম্পর্কে ইমাম আল-যাহাবী (রহ.) বলেছেন ঃ "তিনি ছেলে বেলাতেই মাহ্‌ফিল ও বিদ্যালয়সমূহে উপস্থিত হতেন এবং বড়দের সাথে যুক্তিপূর্ণ ধর্মীয় বাকতর্ক করে উক্ত বিতর্কে বড়দেরকে পরাজিতও করতেন এবং এমন সব যুক্তিপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ বিষয়েরই

অবতারণা করতেন, যাতে জ্ঞানের গভীরতার ক্ষেত্রে শহরবাসীগণ হতভম্ব হয়ে যেত। তিনি মাত্র ১৯ (উনিশ) বৎসর বয়সেই ফাতাওয়া দেন এবং তখন হতেই সংগ্রহ ও সংকলন করতে আরম্ভ করেন।

(আল-উকুদুদ্দুররিইয়্যাহ ৪ পৃষ্ঠা)

তাঁর সমর্থক ও বিরোধী সকলেই তাঁর প্রশংসা করেছেন। তাঁর লেখা গ্রন্থের সুনাম দূর-দূরান্ত পর্যন্ত কাফেলাবাসীগণের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে, হয়তো বা তা তিনশত খণ্ড পর্যন্ত পৌঁছেছে।" (ইমাম যাহাবী, তায্কিরাতুল হুফ্ফাজ, ৪-১৪৭৬ ঃ মুদ্রিত, হায়দারাবাদ ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দ)

ইমাম যাহাবী তদীয় 'মু'আজামে' বলেছেন ঃ "ইবনে তাইমিয়াহ্, জুমু'আর দিনে বড় জামে মাসজিদে তাঁর পিতার স্থানে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের ব্যাখ্যার জন্য বসতেন এবং তাঁর মুখস্থ জ্ঞান হতে দু' কপি বা তার বেশী পরিমাণ উপস্থাপন করতেন। এভাবে জুমু'আর দিনগুলোতে 'সূরা নূহ' এর ব্যাখ্যা কয়েক বৎসর ধরে করেছিলেন।"

ইবনে তাইমিয়াহ্, আল-কুরআনের সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম অর্থসমূহের মধ্যে একেবারে পানির মত সাধারণ ও সহজভাবে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তলিয়ে দেখেছেন এবং যেখানে যেখানে প্রশ্নের অবতারণা হতে পারে তা লক্ষ্য করে সেদিকে মনোনিবেশ করেছেন, আর যা অস্পষ্ট তা তিনি নৈপুণ্যের সাথে দূর করেছেন।

আল-কুরআনের অর্থসমূহ হতে এমন সব বিষয়বস্তু তিনি চয়ন করেছেন, যার দিকে ইতোপূর্বে আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে হাদীসের সনদ (বর্ণনাকারীর সূত্র পরম্পরা) সহ মুখস্থ করার ও সেটার ফিকহ্ ও উসূলের বিষয় বহু দূর পর্যন্ত তিনি পৌঁছেছিলেন। ফিক্হ শাস্ত্রবিদগ্ণের মতভেদ ও মায্হাবসমূহের সূক্ষ্মজ্ঞান, সাহাবী ও তাবিঈগণের ফাতাওয়ার জ্ঞান ও প্রমাণ দ্রুত উপস্থাপনের বেলায় তাঁর জুড়ি মিলতো না। তিনি তাতে এমন অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, যা পাঠক মাত্রকেই অবাক করে দেয়।

Contents

যখন তিনি ফাতাওয়া দিতেন তখন তিনি কোন বিশেষ মায্হাবের অনুসরণ করতেন না বরং যে মায্হাবের সমর্থনে (কুরআন-হাদীসের) প্রমাণাদি যুক্তিযুক্ত হতো সে মত বা মায্হাব বা মায্হাব অনুযায়ীই ফাতাওয়া দিতেন।

সুতরাং তিনি সাল্ফ-ই-সালিহীনদের পথকেই সাহায্য করেছেন, সূফী, দার্শনিক সকলকেই প্রতিহত করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে সালাফী তরীকার পক্ষে বিজয় এনেছেন এবং বহুবিধ মাস্আলায় তাদের ভুলও ধরিয়ে দিয়েছেন। তদুপরি সুন্নাহ্কে সুদৃঢ় দলীলাদি ও প্রমাণ দ্বারা সাহায্য করেছেন।

কামালুদ্দীন বিন ঝামালকানী বলেন ঃ "অবস্থা এমন ছিল যে, যখন ইবনে তাইমিয়াহ্কে শিক্ষকের পক্ষ হতে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হতো, তখন তিনি এমনভাবে সেটার উত্তর দিতেন যে, উপস্থিত শ্রোতা ও দর্শনার্থী মনে করত এ ব্যক্তি এ বিষয় ছাড়া হয়তঃ অন্য আর কিছুই জানেন না আর এরূপ ও সিদ্ধান্ত করত যে এ বিষয়ে এ ব্যক্তির মত আর কেউই জানেন না। যখন ফিকহ্ শাস্ত্রবিদ্গণ তাঁর সাথে বসতেন তখন তাঁরা তাঁদের মায্হাবী বিষয়ে তাঁর নিকট হতে জ্ঞান আহরণ করে লাভবান হতেন ও ফায়দা অর্জন করতেন। এ মহান ব্যক্তির সম্পর্কে এমন কোন তথ্য জানা যায় না যে, কারও সাথে যুক্তি তর্ক করে উত্তীর্ণ হতে না পেরে পরে তা বন্ধ করে দিয়ে কেটে পড়েছেন বরং যখনই কোনও জ্ঞানভিত্তিক আলোচনা করেছেন তখনই তিনি তাতে শ্রেষ্ঠ হয়েছেন। তিনি দুনিয়ার মোহ-মায়া হতে দূরে থেকে জ্ঞানের অন্বেষণ, তার প্রচার ও জ্ঞানানুযায়ী কাজ করা ভিন্ন কোন কিছুতেই স্বাদ পেতেন না।

হাদীসশাস্ত্র ও এতদ্সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ সম্পর্কিত জ্ঞানে তাঁর সমসাময়িক কেউই তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না। এমনকি তাঁর সমকালীন 'আলিমগণ বলেছেন যে, প্রত্যেকটি হাদীস যা ইবনে তাইমিয়াহ্ মুখস্থ করেননি, সেটা

বিশুদ্ধই নয়। হাদীস বর্ণনাকারী ব্যক্তিগণও তাঁদের কে যোগ্য, আর কে-ই বা অযোগ্য এবং কার কি দোষ-ত্রুটি, আর কে কি কি গুণাবলীর অধিকারী ইত্যাদির জ্ঞানসহ তাঁদের শ্রেণী সম্পর্কে পূর্ণ অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল। হাদীসের বিবিধ বিষয়, সেটার কোন্টি উঁচু পর্যায়ের, আর কোন্টি নীচু পর্যায়ের, আবার কোন্টি শুদ্ধ এবং কোনটি অশুদ্ধ (সুস্থ বা রোগা), এতদ্সম্পর্কেও তাঁর সুতীক্ষ্ণ জ্ঞান ছিল। তিনি হাদীসের বর্ণনাকারী পরম্পরাসহ মূল বক্তব্যসমূহ মুখস্থ করেছিলেন।

তাঁর সম্পর্কে আল-বায্যার বলেছেন ঃ "ইসলামী বড় বড় সংকলনগুলো যেমন মুসনাদ-ই-আল-ইমাম আহ্মাদ, সহীহ্ বুখারী, মুসলিম, জামি আল-তিরমিযী, সুনান-ই-আবি-দাঊদ আল-সিজিস্তানী, আন্-নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও আল দারিকুত্নী, নিশ্চয়ই তিনি তাঁদের সকলের নিকট হতেই একাধিকবার শ্রবণ করেছেন।"

জ্ঞান-বিজ্ঞানের খুব অল্প পুস্তকই হবে, যা তিনি (তাঁর সময়ে) না পড়েছেন। আর আসলে আল্লাহ তাঁকে দ্রুত মুখস্থ করা ও দেরীতে বিস্মৃত হওয়ার বিশেষভাবে বিশেষিত করেছিলেন। অবস্থা এরূপ ছিল যে, তিনি কোন বিষয়ের সম্মুখীন হলে বা জ্ঞান অর্জন করলে সেটা তাঁর স্মৃতিপটে হয় হু-বহু শাব্দিকভাবে, না হয় অর্থগতভাবে স্থায়ী হয়ে থাকত আর এভাবেই তিনি তাঁর সমসাময়িক পণ্ডিতগণের হাদীসের চাহিদায় সিহাহ সিত্তাহ (হাদীসের ছয় কিতাব) ও আল-মুসনাদে প্রত্যাবর্তনস্থল তথা সকলের জন্য জ্ঞানের প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ হয়ে উঠেছিলেন।

ইমামুদ্দীন আল-ওয়া-সিত্বি বলেছেন ঃ "ইবনে তাইমিয়াহ্ তাঁর যুগের লোকদের মধ্যে জ্ঞানে ছিলেন সবচাইতে সহীহ এবং ওয়াদা পালনে সবচাইতে সত্যবাদী। সত্যের পক্ষে বিজয়ের ক্ষেত্রে সবার উপরে ও দানশীলতায় অত্যধিক দাতা ব্যক্তি। তাঁদের মধ্যে আল্লাহর নাবী ﷺ-এর পরিপূর্ণ অনুসরণকারী ছিলেন একমাত্র তিনি। আমাদের যুগে এ ব্যক্তি ছাড়া

আর কাউকেও এমন দেখতে পাইনি, যার কথা-বার্তা ও কাজে কর্মে মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবূওয়াতী উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হয়, যাতে যে কোন নিষ্কলুষ অন্তরাত্মাই সাক্ষ্য দিবে যে, নিশ্চয়ই এটাই হল সত্যিকার অর্থে ঐকান্তিক অনুসরণ।

ইমাম তাইমিয়াহ্‌র যুগে দামেস্ক ছিল আল-নাবায়ী, ইবনে দাকীক আল-ঈদ, আল-মুজাবী ও ইবনে জামা'আহ্‌র প্রমুখ খ্যাতনামা আলিমগণের চারণভূমি। তাঁরা সকলেই হাদীস ও সেটার সনদসমূহের গবেষণামূলক অধ্যয়নে যথাযথভাবে একনিষ্ঠ চিত্তে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, যাতে সেটার কোন্‌টির সনদ দুর্বল আবার কোন্ হাদীসটি হাসান ইত্যাদি ও তদ্‌সংশ্লিষ্ট জ্ঞানগর্ভ বর্ণনা দিতে পারেন। তখন হাদীস শাস্ত্র শিক্ষালয়ের পাশেই ফিক্‌হ ও তর্কশাস্ত্র শিক্ষার জন্যও বিদ্যালয়সমূহ পাওয়া যেত, যা ইবনে তাইমিয়াহ্‌কে চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণ করেছিল। তিনি সমালোচনা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে বহু শ্রম দেন এবং তাঁর অনেক মূল্যবান সময় সেখানে অতিবাহিত করেন।

ইবনে তাইমিয়াহ্‌র যুগে সর্বশ্রেষ্ঠ যে সকল আন্দোলন প্রকাশ পায় তন্মধ্যে হাম্বালী ও আশা-ইরাদের মধ্যকার পরস্পর তর্ক ও মুনাজারা তথা মায্‌হাবী দ্বন্দ্বই প্রধান। হাম্বালীগণ আকাঈদের অধ্যয়নে ও গবেষণায় ঐ পথই অবলম্বন করেছিলেন, যে পথ অবলম্বনে তাঁরা ফিকহ্ ও সেটার শাখা মাসআলাগুলোর অধ্যয়ন করেছিলেন। সুতরাং তাঁরা ফিকহ্ বিষয়ক মাসআলার ক্ষেত্রে যেভাবে শারী'আতের হুকুম আহ্‌কাম তথা নির্দেশাবলী আহরণ করছিলেন, ঠিক সেভাবেই আকাঈদের বিষয়গুলোকেও সরাসরি কুরআন হাদীস হতেই চয়ন করছিলেন। কেননা উক্ত দু'টি বিষয়ই এমন, মানুষ যার খুব বেশী প্রয়োজনবোধ করে থাকে। আর আল-দীন (ইসলাম) তো মানুষ যার সবচাইতে বেশী বেশী প্রয়োজন অনুভব করে। আকাঈদ-ঈ-ফিকহ্ এসব বিষয়ের স্পষ্ট ধারণা নিয়ে এসেছে। অথচ

আশা-ইরাগণ এবং অন্যান্যরা দার্শনিকগণ মুতাযিলাহ্ সম্প্রদায়ের ঘৃণ্যপথ অবলম্বন করেছিল। সুতরাং তাঁরা আকাঈদের মতো মৌলিক বিষয়ের উপরও নিজেদের বিবেক বুদ্ধিপ্রসূত প্রমাণাদি ও দর্শনভিত্তিক দলীল ব্যবহার করত। আর এ সময় আশা-ইরা ও হাম্বলীদের মধ্যকার আকাঈদের মত মৌলিক বিষয়ক মতবিরোধ চক্রে ইবনে তাইমিয়াহ্র সম্মুখ প্রতিদ্বন্দ্বীতা ও বলিষ্ঠ ভূমিকা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। আজ পর্যন্ত সেটাই তাঁর ব্রত ও স্বর্ণোজ্জ্বল কীর্তি হিসেবে সর্বজনবিদিত হয়ে রয়েছে। এ মহান মানুষটি ইসলামী আকাঈদের গবেষণায় সেটার প্রথম উৎসস্থলের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে চেয়েছিলেন, যা দার্শনিক বিতর্ক ও অনুকরণ প্রসূত টীকাটিপ্পনী হতে মুক্ত হবে। এটা ঐ সময়ের কথা, যখন সারা দেশ ইবনে তাইমিয়াহ্র বিরোধী পক্ষ ফিকহ্বিদ ও তর্কশাস্ত্র পণ্ডিতগণের স্বার্থে বিজয় লাভ করেছিল এবং এখান থেকেই তাইমিয়াহ্র জীবনটা ছিল ফকীহ্, মুতাকাল্লিমীন (দার্শনিকগণ), সুফী এবং সরকারী লোক তথা আমলাদের সাথে লাগাতার একটানা বৈঠক আর বৈঠক। আর তিনি একটি কাজ হতে অবসর হতে না হতেই আর একটি কাজে জড়িত হয়ে পড়তেন। ইবনে কাসীর তাঁর প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থে ইবনে তাইমিয়াহ্র জীবনের বহু ঘটনা উল্লেখ করেছেন।"

(আল-বিদায়াহ্ ওয়া আন্-নিহায়াহ, ১৪শ খণ্ড, হাওয়াদিস, ৭০৪ সন-৮২৮ সন)

যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর অবদান :

কোন যুদ্ধে তিনি যদি মুসলিম সৈন্যদের কোন ছাউনীতে উপস্থিত হতেন, তাহলে তিনি তাদের জন্য রক্ষাকবজ ও অবিচলতার কেন্দ্রবিন্দু তথা মেরুদণ্ডরূপ হয়ে থাকতেন। যদি তাদের কারও মধ্যে ভয়, দুর্বলতা বা কাপুরুষতার লক্ষণ দেখতে পেতেন, তাহলে তাকে সাহস দিতেন, স্থির রাখতে চেষ্টা করতেন, যুদ্ধে বিজয়ের সুসংবাদ ও গানীমাত তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ওয়া'দা দিতেন এবং তাকে জিহাদ ও মুজাহিদগণের মর্যাদার কথা বর্ণনা করে বুঝাতেন। (আল-বাজ্জার ঃ ৬৭)

দুর্ধর্ষ তাতার বাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে ইবনে তাইমিয়াহ্‌র ভূমিকা ও মুসলিমদেরকে তাতারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রেরণা দান সম্পর্কে ইতিহাস আমাদেরকে স্পষ্ট বর্ণনা দান করছে। ৭০২ হিজরীতে কাশহাবের যুদ্ধে সৈন্যদের সারি এগিয়ে চলেছে, এমন সময় তিনি সৈন্যদেরকে রোযা ভাঙ্গার প্রয়োজনীয়তার উপর ফাতাওয়া দিলেন, যাতে তারা শত্রুদের মুকাবিলায় বেশী শক্তিশালী হয়। এ সুবাদে তিনিও নিজে তাদের সামনে রোযা ভঙ্গ করলেন। দেশের শান্তি রক্ষায় তিনি বিশ্বস্ত প্রহরীর ন্যায় দেয়ালসমূহের উপরই বিনিদ্রভাবে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করতেন।

যখন তাঁর সাহসিকতা ও বীরত্বের কথা জানাজানি হয়ে গেল, তখন মানুষেরা নিজেদের প্রয়োজনে তাঁর নিকট গমন করত এবং আপদে-বিপদে তাঁর শরণাপন্ন হত। ৬৯৯ হিজরীতে তাতারগণ যখন সিরিয়া আক্রমণ করেছিল এবং রাজধানী দামেস্কের অতি নিকটে এসে পড়েছিল, তখন লোকজন ইবনে তাইমিয়াহ্‌র পাশে এসে একত্রিত হয়ে তাঁকে এ আবেদন জানাল যে, তিনি যেন একজন দলনেতা হয়ে রাষ্ট্রদূতের মত তাতার রাজ্যের দরবারে যেয়ে তাদের দামেস্কে প্রবেশ হতে বিরত থাকার ব্যাপারে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আলোচনা করেন।

তাতার রাজ কাজানের সাথে সাক্ষাৎ :

আর সত্যিই তিনি যখন তাতার রাজ 'কাজানের' প্রাসাদে প্রবেশ করলেন, তখন তার সাথে এমন কথাই বলেছিলেন যা তাঁর নির্ভীকতা ও বীরত্বের প্রমাণে সভাস্থ সকলকেই হতভম্ব করে ফেলেছিল। এমনকি রাজা স্বয়ং তাঁর ব্যবহারে আশ্চর্য হন এবং জিজ্ঞেস করেন ঃ কে এ ভদ্র লোক? এমন ভয়ঙ্কর লোক আমি আর জীবনে দেখিনি। তাঁর চাইতে স্থিরচিত্ত লোকও আর কাউকেও দেখিনি এবং আমার অন্তরে তাঁর কথার চাইতে বেশী স্থায়ী হতে পারে এমন কথাও আর শুনিনি। আর আমার স্বত্ত্বাকে তাকে ছাড়া আর অন্য কাউকেও এত বেশী স্বীকার করতে দেখিনি।

(তারীক-ই-ইবনে আল-ওয়ারদী, দেখুন ঃ ২-২৮৭ ঃ আল-বাজ্জার ঃ ৭২-৭৩)

তিনি ঐ প্রসঙ্গে তাতার রাজকে যা বলেছিলেন ঃ তন্মধ্যে "আমার জানামতে তুমি দাবী করছ যে তুমি মুসলিম, তোমার সাথে কাজী, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং শাইখগণ রয়েছেন। তোমার বাপ ও দাদা উভয়েই কাফের ছিল। তবুও তুমি যা করছ তারা সেটা করেননি। তারা উভয়েই আমাদের সাথে সন্ধি চুক্তি করেছেন এবং সে অনুযায়ী কাজও করেছেন, অথচ তুমি চুক্তি করেছ আর গাদ্দারী করে সেটা ভঙ্গ করেছ। আমাদের অনেক লোক হত্যা করেছ; কিন্তু রক্তের বদ্‌লা দাওনি"। তাঁর এ কথাগুলোতে সীমাহীন বারাকাত নিহিত ছিল, যাতে তিনি নিজেদের দেশে তাতারদের প্রবেশ না করার ব্যাপারে কাজান হতে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন।

এ বৎসরই মারজি সাফ্‌রির ঘটনার দিকে তাতারদের আক্রমণ ও যুলুমের কারণে সকল মানুষের অন্তরে হতাশা বিস্তার করেছিল। ওদিকে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, আবার দেশ জুড়ে অশ্লীলতাও বেড়ে গিয়েছিল। এ সময় তাতারগণ দামেস্কের দূর্গ দখল করতে চেয়েছিল। এ উদ্দেশে 'কাব্‌জাক্‌' তাতার বাহিনীর হাতে উক্ত দূর্গ অর্পণ করার জন্য দূর্গের নায়েবের বরাবরে একটি ঠিঠি লিখেছিল, যাতে দেশের অবস্থা শান্ত হয় এবং সার্বিক অবস্থা স্থিত হয়; কিন্তু ঐ খবর ইবনে তাইমিয়াহ্‌র কাছে পৌঁছতে না পৌঁছতেই তিনি নায়েবের প্রতি এক আদেশনামা লিখলেন–

"যদি পার তাহলে সেটার (দূর্গের) এক খণ্ড পাথর অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত সেটা কারও হাতে ছেড়ে দিও না।"

অতএব আরজাওয়াশ্‌ ইবনে তাইমিয়াহ্‌র আদেশে কেল্লা হতে অবতরণ করলে এবং দূত পাঠিয়ে কাব্‌জাককে বলে দিলেন, "আমি এটা (দূর্গ) কস্মিনকালেও তোমাদের হাতে সমর্পণ করব না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাতে একটি চোখও পলক দিবে। আর তাতেই ঐ কেল্লা মুসলিমদের জন্য নিরাপদ ও শত্রুদের জন্য দুর্ভেদ্য দূর্গ হয়ে রয়েছে।"

মিসরীয় সুলতানের প্রতি নাসীহাত :

৭০০ হিজরীতে একবার প্রচার হয়ে গেল যে, তাতারগণ দামেস্ক আক্রমণের জন্য অতি নিকটে এসে পড়েছে। এতে লোকজন তাতার বাহিনীর হাত হতে বাঁচার জন্য শত্রুকে দেশ লুণ্ঠন করার সুযোগ দিয়ে এলাকা ছেড়ে চলে যেতে লাগল। এতে ইবনে তাইমিয়াহ্ মিসরীয় সুলতান ও শাসকদের নিকট দেশের জন্য সাহায্য সহযোগিতা চাইতে গেলেন এবং মিসরের সুলতানকে এ কথা বলে শাসালেন যে, "যদি তোমরা দেশ রক্ষা হতে বিরত থাক, তাহলে যে তাকে রক্ষা করবে এবং শান্তির সময় কাজে লাগাবে আমরা তাকেই প্রতিষ্ঠিত করব। আর এটা যদি নিরূপিত হয়ে থাকে যে, তোমরা এ দেশের বাদশাহ্ও নও আর শাসকও নও, এটার পরও মুসলিমগণ তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে তোমার কাছে সাহায্য চায়, তবুও তোমাদের উপর সাহায্য করা অবশ্য কর্তব্য। আর যখন তোমরা দেশের শাসক, তারা তোমাদের প্রজা-সাধারণ, তোমরা তাদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল, তখন তোমাদের এ ব্যাপারে কেমন ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত তা তোমরাই বুঝে দেখ। (আল-বিদায়াহ ওয়া আন-নিহায়াহ ঃ ১৪-১৫)

মুসীবাতের অগ্নি পরীক্ষা :

মোটকথা, যখনই ইবনে তাইমিয়াহ্র সামনে বিপদাপদ ও মুসীবাত উপস্থিত হত, তখনই তিনি অধিক সাহসী হতেন ও সেটার মুকাবিলা করতেন। ৭০৭ হিজরীতে ইবনে তাইমিয়াহ্ সুফীগণের এক শ্রেণীকে অপমান করেন এবং তাঁদের বিরুদ্ধে কিছু কথা বলার প্রেক্ষিতে তাঁকে আটক করার জন্য সুলতানী ফরমান জারী হয়। এ মর্মে কাজী ও ফকীহ্গণের নিকট তাঁকে বন্দী করার বৈধতার পক্ষে ফাতাওয়া দিতে অনুরোধও করা হয়। কিন্তু ফকীহ্গণ শাইখের কাছে শারী'আতের দৃষ্টিতে এতটুকু ত্রুটিও পেলেন না, যাকে কেন্দ্র করে অন্ততঃ তাঁকে বন্দী করার পক্ষে ফাতাওয়া দাঁড় করাতে পারেন। এতে তাদের বিষয়টিতে অস্থিরতা

পরিলক্ষিত হল। ইবনে তাইমিয়াহ্ যখন তাদের চোখে মুখে গ্লানি ও বিষাদের স্পষ্ট ছাপ অবলোকন করলেন, তখন তিনি স্বয়ং বন্দীশালার দিকে এ কথা বলতে বলতে অগ্রসর হলেন– "আমি নিজে স্বেচ্ছায় জেলের দিকে (জেলে) যাচ্ছি এবং যাতে মুসলিমগণের মঙ্গল রয়েছে তারই সন্ধান আমি ওখানে করব।" (আল-বিদায়াহ ওয়া আন-নিহায়াহ ঃ ১৪-১৩৫ ও তারপরও)

অসৎকাজের বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম ঃ

ইবনে তাইমিয়াহ্র বীরত্ব তাঁর জীবনে শুধু মাতৃভূমিকে নিয়েই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং তাঁর দীনীশক্তি ও সেটা পালনে আপন চিন্তা ও চেতনা নিয়োজিত করেছিলেন। সুতরাং তিনি দীনকে যাবতীয় অশ্লীলতা, বিদ'আত এবং সন্দেহসমূহ যা কিছু ঐ দীনের মধ্যে প্রবেশ করেছে ও ভয়ঙ্কররূপ পরিগ্রহণ করে সমাজের উপর সেটার ভয়াবহতা বিস্তার করেছে– সেটা হতে পবিত্র করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন।

তাঁর জীবনের এ দিকটি তাঁর সময় ও শক্তি সামর্থ্যের এক বিরাট অংশ দখল করে নিয়ে গিয়েছিল এবং তাঁর বিরুদ্ধে আনিত অপবাদ ও তাঁর জীবনের সকল দুঃখ কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কেননা ইসলামী দেশসমূহ কোনও ধরনের বিদ'আত ও অশ্লীলতা প্রকাশ হওয়াটা একটা মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি, যা হতে তিনি সমাজকে পূর্ণমাত্রায় সুস্থ রাখতে চেয়েছিলেন। যেহেতু কোনও সমাজে অমূলক ও আজগুবি বিষয় ও বিদ'আত (তথা ধর্মীয় বিষয়ে কোন নতুন সংযোজন) ছড়িয়ে পড়াটা ঐ সমাজ ধ্বংস ও বিলীন হবার আভাস এবং তার শত্রুদের চোখে সেটার শক্তি খর্বকারী।

সুদীর্ঘ দিন ধরে ইবনে তাইমিয়াহ্ তাঁর রুগ্ন সমাজের জন্য সুদক্ষ চিকিৎসকের ভূমিকায় ছিলেন। কিন্তু ততক্ষণে ব্যামোটা ভয়ঙ্কররূপ ধারণ করে নিয়েছিল, রোগটি রোগীর সারাটা দেহেই বিস্তার লাভ করেছিল। সুতরাং বিদ'আত প্রথা এবং অশ্লীলতা সমাজের নিত্যদিনের অভ্যাসে

পরিণত হয়েছিল। আর এ কথাটিও সত্য যে, কোন প্রথাকে সহজে পাল্টানো এবং কোন অভ্যাসের সহসাই মূলোৎপাটন করা একজন সংস্কারকের জন্য খুবই কঠিন ব্যাপার। আর এজন্যই ইবনে তাইমিয়াহ্ তাঁর সমাজের চোখে প্রচলিত প্রথা হতে দূরের এবং সামাজিক অভ্যাস বিরোধী সত্ত্বা হিসেবে প্রতিভাত হলেন। এটার পর হতেই তাঁর জীবন ছিল বিপদাপদ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরস্পর বিজড়িত করায় তৈরী শিকল স্বরূপ। কতগুলো কঠিন ক্ষেত্র ছিল, যেখানে তাঁর অস্ত্র ছিল কখনও বর্শা আবার কখনও বা মুখের ভাষা। এসবগুলোর ক্ষেত্রে পশ্চাতেই এ বীরোচিত ব্যক্তিত্ব বলিষ্ঠভাবে কাজ করেছে। সুতরাং কোন সুলতানকে তিনি অস্বীকার করবেন এতে তাঁকে দোষ দেয়া যাবে না। অথবা কোন আত্ম গৌরবান্বিত ব্যক্তিকে তিনি 'আমাল দিবেন না, তাতেও তাঁর কিছু আসে যায় না। কেননা তিনি ছিলেন ক্ষুরধার যুক্তির অধিকারী এবং অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে সবচাইতে ধারালোটি তো তাঁরই কাছে ছিল। কাজেই ভয়ের কি আছে?

এখান হতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি বিদ'আতের শ্রেণীভেদে প্রত্যেক বিদ'আতীর বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং দার্শনিক, ভেদবাদী, বাতিনী, শী'আ, সূফী, কারামাতিয়া এবং ইসমা'ঈলীয়া সম্প্রদায়ের মতবাদের সমালোচনা করতে ও সেটার অসারতা বর্ণনায় আত্মনিয়োগ করেন। এ পথে এদেরও তাদের সকলেরই গোপন ভেদ ফাঁস করে দিয়ে সত্য ও সত্য দীনের পক্ষে তাদের সকলের উপর শুভ বিজয় লাভ করেন।

সুফীবাদী ও ভেদবাদীদের বিরুদ্ধে ইবনে তাইমিয়াহ্র বিদ্রোহ চরম পর্যায়ে উঠেছিল। তিনি তাদের অমূলক আজগুবি কর্মকাণ্ড হতে যা দ্বারা বোকাদের শেষ বুদ্ধিটুকুও কেড়ে নেয়া হয়েছে এবং সাধারণ মানুষের মাথা অবনমিত করানো হয়েছে– তাঁর সমাজকে এ ঘোষণার মাধ্যমে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন যে, <u>মুহাম্মাদ ﷺ-এর পথনির্দেশনা ব্যতীত আল্লাহকে পাবার</u>

আর দ্বিতীয় কোনও পথ নেই। এজন্য পবিত্র কুরআনের নির্দেশিত পথ ছাড়া বিকল্প নেই।

একদা সুফীগণ সুলতানের উপস্থিতিতে তাঁর পাশে জমা হয়ে তাঁকে অনুরোধ করলেন যে, তিনি যেন তাদের অবস্থার উপর আর হস্তক্ষেপ না করে বরং তাদেরকে যথা অবস্থায় ছেড়ে দেন। তখন ইবনে তাইমিয়াহ্ তাদেরকে উদ্দেশ্য করে ঘোষণা করলেন যে, কাউকেও একটি কাজ বা কথায় শারী'আত হতে বের হয়ে যাবার অনুমতি দেয়া যাবে না। তবে যদি তাদের মধ্যে কেউ দোযখে প্রবেশ করতে চায়, তাহলে সে যেন গোসলখানায় তার শরীর ধৌত করে নেয়, অতঃপর সিরকা দ্বারা শরীর মর্দন করে আগুনে প্রবেশ করে। আর সে যদি আগুনে প্রবেশও করে তবুও তার প্রতি সহানুভূতির সাথে তাকানো হবে না, কারণ এটা এক ধরনের দাজ্জালী ও ফাঁকী এবং ভেল্‌কিবাজি!

শেষে তাঁর কথা যখন তাদেরকে একেবারে অনন্যোপায় করে ফেলল, তখন তারা সুলতানকে এ কথা বলে প্রস্থান করল : "তাঁতারদের নিকট যাওয়া ছাড়া আমাদের অবস্থাসমূহের মিল হবে না, আর শারী'আতের সামনে তো মিল হবেই না।" (আল-উকুদুদ্দুররিইয়্যাহ : ১৯৬ পৃষ্ঠা)

সুলতান কালাউনের পরামর্শ :

সত্যের জন্য ইমাম তাইমিয়াহ্ সাহসী হওয়ার সাথে সাথে অত্যধিক সহনশীলও ছিলেন, যেহেতু সহনশীলতা সেটার অধিকারীকে সম্মানিত করে থাকে। সুলতান 'কালাউন' একবার ইমাম তাইমিয়াহ্‌কে ঐ সকল 'আলিমগণকে হত্যা করতে ফাতাওয়া দেয়ার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন, যাদের পক্ষ হতে তাঁকে বন্দী করার জন্য বারবার ফাতাওয়া এসেছিল। এ সময় কাজী, ফকীহ্গণও শাইখের ও সুলতানের শত্রুদেরকে অনেক সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলেন। সুতরাং এখন সুযোগ বুঝে সেটা কাজে

লাগাতে চাইলেন এবং তাদেরকে হত্যা করার পক্ষে ইমাম তাইমিয়াহ্‌র নিকট ফাতাওয়া চাইলেন, কিন্তু তাঁর অসীম ধৈর্য, সহনশীলতা ও ক্ষমাগুণ ঐরূপ প্রতিশোধমূলক কাজ হতে তাঁকে বারণ করেছিল। তাঁর বীরোচিত আত্মা ঐ সকল 'আলিমগণকে হত্যার সুবর্ণ সযোগ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। এ সুবাদে তিনি সুলতানকে বলেছেন : "যে ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দিয়েছে, সে অত্র বিষয়ে বৈধ অবস্থায় আছে। আর যে লোক আল্লাহ ও তদীয় রাসূল ﷺ -কে কষ্ট দিবে স্বয়ং আল্লাহই তার কাছ হতে পূর্ণ প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। আজ যদি তুমি ঐ সকল 'আলিমগণকে হত্যা করে ফেল, তাহলে তাদের পরে তাদের মত আর কাউকেও পাবে না।"

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.)-এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য :

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) সপ্তম হিজরীর শেষদিকে বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচী পালনসহ সামগ্রিকভাবে সমস্ত কুসংস্কার আর কায়েমী স্বার্থবাদীদের বিরুদ্ধে এক আপোষহীন সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। ফলে একটি চক্র ও একশ্রেণীর আলিম-ফকীহ মনগড়া ও দিকভ্রান্তভাবে সমাজে সর্বত্র তাদের আধিপত্য ও প্রভাবের এক প্রাচীর তৈরী করেছিল। শাইখুল ইসলামের এক নবতর উদ্দীপনা ও চিন্তা-চেতনা নিয়ে ঘুণে ধরা জাতির ভিত্তিমূলে এক নতুন আলোর দীপশিখা প্রজ্জ্বলিত করেন। ফলে কায়েমী স্বার্থান্বেষী চক্রটি ইমাম ইবনে তাইমিয়ার বিরুদ্ধে নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা ও অপরিণামদর্শী বিবেকহীন প্রতিরোধের মাধ্যমে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.)-এর জীবনে মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল মূলতঃ তিনটি বিষয়ের সঠিক প্রতিফলন ঘটানো। প্রথমতঃ আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের দীন প্রচার ও বাস্তব জীবনে তার পরিপূর্ণ রূপদান করা। আর দ্বিতীয়তঃ পৃথিবীর বুক হতে ইসলাম বিরোধী বাতিল বিভিন্ন মতবাদ ও আকীদাসমূহ সংস্কার করে কুরআন ও সহীহ হাদীসের

আলোকে ঘষে মেজে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং তৃতীয়তঃ জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে বিশ্বে মুসলিম জাতিকে ইসলাম বিরোধী শক্তির কবল হতে উদ্ধার করা।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মূলতঃ তাঁকে উপরোক্ত কাজসমূহ পরিপূর্ণভাবে সম্পাদন করার যোগ্য নেতৃত্বদানের সুযোগ দিয়েছিলেন। ইসলাম বিরোধী সমস্ত চক্রান্ত ও চিন্তাধারায় যে সমস্ত বাতিল শক্তির উদ্ভব হয়েছিল ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) সুদৃঢ়ভাবে তা প্রতিরাধ করেছিলেন। আর মুসলিম জাতির সম্মুখে দিক-নির্দেশনার ক্ষেত্রে সঠিকভাবে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে পরিপূর্ণ এক দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

শাইখুল ইসলাম সারাটি জীবন শুধু দুঃখ-যন্ত্রণা আর ব্যথা-বেদনায় জর্জরিত হয়েছেন তবু এসব ক্ষেত্রে কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। বরং চরম শত্রুদেরকেও ক্ষমা করে দেয়ার অনুপম এক মহান আদর্শ পৃথিবীর বুকে রেখে গেছেন।

এ প্রসঙ্গে সুলতান কালাউন যখন ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.)-কে যে নানাভাবে উত্তেজিত করে তৎকালীন কাযী ও আলেমদের বিরুদ্ধে ফতোয়া চাইলেন তখন শাইখুল ইসলাম নিম্নের ভাষায় বলেছিলেন ঃ "আমার ব্যাপারে আমি কতটুকু বলতে পারি, যারা আমাকে কষ্ট দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। তাদের আমি ক্ষমা করে দিয়েছি। আর যারা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পাপ কাজে সম্পৃক্ত হয়েছে তাদের কার্যকলাপের প্রতিশোধ নেবার জন্য আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন নিজেই যথেষ্ট। আমার নিজের জন্য কখনো প্রতিশোধ নিই না।"

পৃথিবীর বুকে সমস্ত মাযহাবের সীমারেখা অতিক্রম করে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের প্রকৃত দীন ও শির্কসহ সমস্ত কুসংস্কার ও বিদআতের

উৎখাত করে নির্ভেজাল সুন্নাহ প্রতিষ্ঠা ও প্রসারই তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল।

তাই তৎকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী শাইখ ইমামুদ্দীন (রহ.)-এর মুখে সেই সত্যেরই বহিঃ প্রকাশ ঘটেছিল।

"আজ আকাশের তলে ইবনে তাইমিয়ার সমতুল্য আর কাউকেই দেখা যায় না। না ইল্‌মের দিক দিয়ে, না 'আমলের দিক দিয়ে। আল্লাহর শপথ- কারো কথা ও কাজের মধ্যে যদি নবুওয়াতে মুহাম্মাদীর উজ্জ্বল আলোক-জ্যোতি পরিপূর্ণভাবে উৎসারিত হয় তবে তাকে দেখে আমরা বিমুগ্ধ কণ্ঠে বলতে পারি– এটাকেই বলে নাবীর সত্যিকার অনুসরণ, তবে তিনি ইবনে তাইমিয়াহ ব্যতীত অন্য কেউ নন।"

তাঁর জীবনের শেষ কিছু কথা :

শাইখুল ইসলামের জীবনের শেষদিন পর্যন্ত যে অন্তরজগৎ ছিল আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন দীন প্রতিষ্ঠায় নিমগ্ন। আর নাবী মুহাম্মাদ ﷺ-ও তাঁর সহীহ হাদীসের আলোকের সেই প্রকৃত দীনের অবিকল বাস্তবায়ন। পৃথিবীর ইতিহাসে শাইখুল ইসলামের প্রতি এমন এক মানসিক নির্যাতন নিপীড়ন খুব কম মানুষের ভাগ্যেই এভাবে নির্ধারিত হয়েছিল। আল্লাহ আয্‌যা ওয়া জাল্লা তাঁকে যে ধৈর্য ও সবর দান করেছিলেন তা এক বিরল অধ্যায়। কারাগারের এখানে সেখানে যে কাগজসমূহ সংগ্রহ করেছিলেন তা কালির পরিবর্তে কয়লা দিয়ে লিখেছিলেন। আর জীবনের শেষ অধ্যায়ে লিখেছিলেন তা যেন বিদায়ী সূর্যের এক উজ্জ্বল আলোকরশ্মি বলা যেতে পারে। এ এক ব্যথাতুর মহামানবের সেই সত্য ভাষণ তা আজও মানুষকে যুগে যুগে সত্য ও ন্যায়ের পথে আহ্বান জানায়। 'সিরাতুল মুস্তাকীমের' পথে চালিত করে। তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায় হৃদয়-মন দিয়ে অনুধাবন করলে অন্তর স্পর্শ করে আর চোখের পাতা ভিজে আসে। নিম্নে তাঁর শেষ লেখার কিছু অংশ উদ্বৃত হলো ঃ

"আমি আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের অনুগ্রহে খুবই সন্তুষ্ট, আল্লাহ যা কিছু করেন ইসলামের মঙ্গলের জন্যই করেন। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য পৃথিবীর সবচাইতে বড় নিয়ামাত। তিনি তাঁর রাসূলকে তাঁর তাওহীদ বাণী প্রচার করার জন্যই পাঠিয়েছিলেন। আর শয়তান অনাগত কাল হতেই তাঁর অনুগত সৈনিক বাহিনীর সাহায্যে ইসলামের গৌরব বিনষ্ট করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। প্রথম দিন হতেই আল্লাহর এ নিয়ম অব্যাহতভাবেই চলে আসছে। আর তিনি সত্যের সাহায্যের জন্য এমন সব মানুষ নির্বাচন করেন যারা বাতিল মতবাদ ও ইসলাম বিরোধী আকীদা ও 'আমলের মূল উৎসস্থলসমূহের উপর অগ্নিবর্ষণ করেন। ইবলিস শুধু দীন ইসলামের শত্রুতা করেননি, সমগ্র ধর্ম ও তাদের অনুসারীদের চলার পথে সৃষ্টি করেছে বাধা-বিপত্তি।"

"আমার উপর বিরোধীগণ নানাভাবে দোষারোপ করেছে আর আল্লাহ তাদের লাঞ্ছিত করেছেন। আমাকে বিদআতী আখ্যায়িত করা হয়েছে অথচ আসল ব্যাপারটি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান লাভ করার পর শুধু সেই বিদআতী থাকতে পারে যাকে পাশবিক লালসার উৎকট তাড়না ব্যস্ত করে তুলেছে। আর সে শুধু আপন মনের চাহিদার পূজারী হয়ে গেছে। আল্লাহর হাজারো শুকর, তিনি আমাকে জিহাদ করার সুযোগ দিয়েছেন এবং আমি আমার সাধ্যানুসারে বাতিলের দূর্গ চূর্ণ করে দিয়েছি।"

এটা ইমামের ইন্তিকালের পূর্বে এ লেখা। কাগজ, কালি ও কলম হতে বঞ্চিত হয়ে ইমাম সাহেব একান্তভাবে নিবেদিত একপ্রাণ ডুবে গেলেন 'ইবাদাতে ও কুরআনের মর্ম বাণী অধ্যয়নে। এ সময়ে তাঁর দা'ওয়াত ও পয়গামের বাণী পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে প্রান্তে প্রসার ও বিস্তৃতি লাভ করেছিল। হয়তো তাঁর জীবন বায়ু এ সময় আল্লাহর আহ্বানের অপেক্ষায় ঊর্ধ্ব জগতে প্রত্যাবর্তনের জন্য উদ্বেলিত হয়েছিল।

তাঁর ধৈর্য ও মহাপ্রস্থান :

জগৎসংসার মানব প্রকৃতি এরূপই চলে এসেছে যে, যাঁরই কৃতিত্বের নক্ষত্র ঊর্ধ্বে উঠিয়েছে এবং গৌরব ও সম্মানে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, তাঁরই ঈর্ষাকাতর শত্রুদের সংখ্যা বেড়েছে। ইবনে তাইমিয়াহ্‌র ঈর্ষাকারীদের সংখ্যা কতই না বেড়েছিল। নিশ্চয়ই লোকটির রচনা ও লিখনী কাউকেও তাঁর বন্ধু বানায়নি। কারণ তিনি কাউকেও তোষণ করেননি। আর কপটতা তাঁর অন্তর পর্যন্ত কোনরূপ পথই খুঁজে পায়নি। ইবনে তাইমিয়াহ্‌র বেশিরভাগ বিপদের সময়েই তাঁর বিরোধিতা করছিল তাঁর বিরুদ্ধে আনীত মামলার বিচারকমণ্ডলী ও ফকীহ্‌গণ; যাদের রায় ও ফাতাওয়াগুলোর কারণে তাদের বিরুদ্ধে তাঁর বিরোধিতা প্রকটতর হয়েছিল। তাঁর প্রথম পরীক্ষা আরম্ভ হয় ৭৫০ হিজরী, যেদিন সুলতানের আদেশক্রমে তাঁকে বন্দী করা কার্যকর করার জন্য তাঁকে মিসরে নিয়ে আসা হয়। ইবনে তাইমিয়াহ্ যখন বিচারকমণ্ডলী ও ফকীহ্‌গণের সম্মুখে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি নিজেকে রক্ষা করার জন্য কথা বলতে চেষ্টা করলেন; কিন্তু তারা সে সুযোগ হতে তাঁকে বঞ্চিত করল। উপরন্তু ইবনে মাখলুফ তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা দাবী তুলল যে, তিনি বলেন : "নিশ্চয়ই আল্লাহ সত্যিকারভাবে 'আর্‌শের উপর আছেন এবং শব্দ ও অক্ষর দ্বারাই তিনি কথা বলেন।" অতঃপর ইবনে তাইমিয়াহ্ বললেন : আমার বিচার করবে কে? তখন ইবনে মাখ্‌লুফ বললেন : 'আমি'। তখন ইবনে তাইমিয়াহ বললেন : "তুমি আমার প্রতিপক্ষ তথা বাদীপক্ষ হয়ে আমারই বিচার আবার কিভাবে করবে?" এতে ইবনে মাখলুফ রোষাভিভূত হয়ে তাঁকে কারাগারে পুরে রাখল। এ ঘটনাটি ঘটেছিল ৭০৫ হিজরী সনের ২৬শে রামাযান, রোজ শুক্রবার। এরপর ঈদের দিন তাঁকে এ বন্দীখানা হতে সরিয়ে অন্যত্র এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তী বৎসরটিও তিনি ঐ অবস্থাতেই রইলেন। মিসরীয় কতকজন 'আলিম মিসরের খলীফার নায়েব (সাইফুদ্দীন

সালার)-এর নিকট গিয়ে তার সাথে শাইখকে তাঁর কতিপয় বদ্ধমূল বিশ্বাসসমূহ হতে বাইরে আসতে বলেছিলেন। অতঃপর তাঁর নিকট দূত পাঠালেন, যেন ঐ ব্যাপারে তাঁর সাথে কথা বলতে পারে। এতে তিনি তাদের সম্মুখে হাযির হওয়া হতে বিরত রইলেন। তাঁর নিকট পুনঃপুনঃ বহুবার দূত আসল, যাতে তিনি তাদের সম্মুখে উপস্থিত হন; কিন্তু তিনি তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করেননি। এতে তাঁর উপস্থিতির ব্যাপারে নিরাশ হয়ে তারা প্রস্থান করলেন।

৭০৭ হিঃ ১৪ই সফর, রোজ শুক্রবার, বিচারপতি ইবনে জামা'আহ্ কিল্লার ভিতরে ইবনে তাইমিয়াহ্র নিকট গেলেন এবং তাঁর সাথে দারুল আওহাদীতে মিলিত হলেন ও কারাগার হতে তাঁর বাইরে আসার বিষয়ে আলাপ আলোচনা করলেন; কিন্তু ইবনে তাইমিয়াহ্ জেলমুক্তির আলোচনা প্রত্যাখ্যান করলেন, যদি না আরোপিত সকল প্রতিবন্ধকতা ও শর্তাদি প্রত্যাহার করা হয়। আবার ৭০৭ হিজরী ২৩শে রবিউল আউয়াল, আমীর হুসামুদ্দীন মুহনা বিন 'ঈসা স্বয়ং তাঁর নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁর সাথে জেলের ভিতরে একান্ত ব্যক্তিগতভাবে মিলিত হয়ে তাঁকে জেল হতে বের হবার ব্যাপারে শপথ করে বলেন যে, তিনি যা বলবেন ও বিশ্বাস করবেন, তাতে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকবেন। তবুও পূর্ব আরোপিত সকল প্রতিবন্ধকতা প্রত্যাহার ও শর্তাদি বাতিল করার পূর্ব পর্যন্ত তিনি জেলখানা হতে বের হননি। এরপর তিনি আমীর সালাবের সাথে জেলখানা হতে বের হন এবং 'আলিমগণের ও ফকীহ্দের একটি দল তাঁর কাছে উপস্থিত হন। উক্ত সালার শাইখকে মিসরে অবস্থানের জন্য বলেন, যাতে লোকজন তাঁর জ্ঞান ও উচ্চ সম্মান প্রত্যক্ষ করতে পারে।

৭০৬ হিঃ-এর শাওয়াল মাসে সুফীগণ অনেকগুলো ব্যাপারে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারের কাছে বিভিন্ন অভিযোগ আনল এবং ইবনে আতাও তাঁর বিরুদ্ধে অনেক বিষয়ে দাবী এনেছিল, ঘটনাক্রমে যার কিছুই প্রমাণিত

হয়নি, অথচ সরকার ইবনে তাইমিয়াহ্‌র বিষয়টি ফকীহ্‌গণের নিকট ছেড়ে দিয়েছিলেন, যাতে সুফীগণের দাবীর ব্যাপারে তারা তাদের রায় দিতে পারে। এতে কতক ফকীহ্‌গণ বললেন, ইবনে তাইমিয়াহ্‌ যে বিষয়ে যা বলেছেন এতে তাঁর কোনই অপরাধ নেই। আর ইবনে জামা'আহ রায় দিলেন সেটা ছিল তাঁর জন্য অশিষ্টাচার ও অশোভনীয়।

অতঃপর সরকার তাঁকে অনেকগুলো ব্যাপারে এখ্‌তিয়ার-অধিকার দিয়েছিল; হয় তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় না হয় দামেস্কে চলে যাবেন, কিন্তু কিছু শর্ত সাপেক্ষে অথবা তাঁকে জেলে ঢুকানো হবে। তখন ইবনে তাইমিয়াহ্‌ জেলের বাইরে বোবা হয়ে থাকার চাইতে জেলের ভিতরের জীবনকেই ভাল বলে অগ্রাধিকার দিলেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক সুফী শাইখগণ তাঁকে দামেস্কের দিকে সফর করার জন্য পুনঃপুনঃ তোষামোদ করলেন তিনি তাদের অন্তরের সন্তুষ্টি নিবারণের জন্য তাদের অনুরোধে সাড়া দিলেন।

শাওয়ালের ২৮ তারিখে ডাকে (মনে হয় সরকারী ডাকে, সরকারী তত্ত্বাবধানে কোথাও সফর করার যান বিশেষ, যেমন ঘোড়ার ডাক) দামেস্কে অভিমুখে রাওয়ানা হলেন। দামেস্কের পথে খুব বেশী সময় অতিবাহিত হয়নি। মাত্র এক রাত্রি, পরের দিনই তাঁর পিছনে তারা দ্বিতীয় আরও একটি ডাক পাঠিয়েছে, এরপর তাঁকে পুনঃ মিসরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। তিনি ইবনে জামা'আর কাছে উপস্থিত হলেন, এমতাবস্থায় তার ওখানে ফকীহ্‌গণের এক সমাবেশ ছিল, তাদের কেউ কেউ কথায় বললেন : "সরকার ইবনে তাইমিয়াহ্‌কে বন্দী করা ব্যতীত খুশী হবে না।"

ইবনে জামা'আহ্‌ মালিকী মায্‌হাবের বিচারকের প্রতি শাইখকে বন্দী করার আদেশ প্রদান করতে অনুরোধ করলেন, এতে বিচারক অসম্মতি জ্ঞাপন করে বললেন : "আমার নিকট তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত কোন কিছু প্রমাণিত হয়নি। সুতরাং আমি তাঁকে বন্দী করার হুকুম দেই কিভাবে?

অতঃপর নুরুদ্দীন আল-জাওয়ারী (মালিকী মায্হাবের কাজী) কেউ একই অনুরোধ করলে তিনিও তাতে বিরত রইলেন।

অতঃপর যখন তাইমিয়াহ্ তাদের চোখে মুখে তাঁকে বন্দী করতে না পারায় হয়রানীর চিহ্ন লক্ষ্য করলেন, তখন তিনি স্বেচ্ছায় স্বয়ং জেলখানার দিকে এ কথা বলতে বলতে এগিয়ে গেলেন "আমি স্বয়ং স্বেচ্ছায় জেলে যাচ্ছি সেখানে কি মঙ্গল আছে আমি তা অন্বেষণ করব।"

অতঃপর ঐ কাজী সাহেব বললেন, "শাইখের ঐরূপ যোগ্যস্থানেই থাকা প্রয়োজন যা তাঁর মত লোকের জন্যই কেবল শোভা পায়।"

এরপর তাঁকে বলা হল যে, জেল ছাড়া অন্য কিছুতেই সরকার খুশী নয়, সুতরাং শাইখকে জেলেই পাঠিয়ে দেয়া হল। ঐসবই হয়েছিল 'আল-মাম্বাজী' ধর্মের যারা অনুসারী, তাদেরই ইঙ্গিতে। শাইখ জেলেই রইলেন। আর এদিকে লোকজন তাঁর নিকট ফাতাওয়া চাইতে আসত। যেসব জটিল জটিল মাস্আলাসমূহে তিনি ছাড়া অন্যরা অক্ষম হতো এবং জ্ঞানীগণও হিমশিম খেত ঐসব বিষয়ে তিনি তাদেরকে ফাতাওয়া লিখে দিতেন।

অতঃপর শাইখ কারাগার হতে বের হলেন এবং আলেকজান্দ্রিয়ায় নীত হলেন। সেখানে তিনি কিছুকাল অবস্থান করলেন। এ সময় তিনি বিভিন্ন ধরনের চিন্তাভাবনা, ভয়ভীতি ও যুল্ম নির্যাতনের শিকার হলেন। এ সময় সুফীগণ তাঁর বিরুদ্ধে গীবতের মাধ্যমে বদ্নাম রটনা করে বসল এবং তাঁকে অতর্কিতে হত্যা করে তাঁর যাবতীয় চ্যালেঞ্জ হতে মুক্তি লাভের চেষ্টা করল। অথচ আল্লাহ তা'আলা তদীয় মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের হাফিযগণের মধ্য হতে তাঁর ও অন্যদের জন্য এমন সকল ব্যক্তিগণকে নির্ধারিত করেছিলেন, যারা তাঁর পক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন এবং তাদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র হতে তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু ঐ সুফীগণ আর একবার তাঁকে আলেকজান্দ্রিয়ার জেলে রাখার ব্যাপারে কৃতকার্য হয়েছিল, একসাথে তাঁর ধ্যান ধারণার বিশ্বাসী তাঁর অসংখ্য শিষ্যদেরকেও কারাদণ্ড দেয়া হয়েছিল।

সুলতান কালাউনের শাসনভার গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর উপর কারাগারের ভিতর অমানুষিক নির্যাতন চলছিল। তিনি এসে সর্বপ্রথম যা করতে চাইলেন, তন্মধ্যে ছিল ইবনে তাইমিয়াহ্‌কে তাঁর বন্দীদশা হতে বের করা। অতএব ৭০৯ হিজরী ঈদুল ফিত্‌রের দিন সুলতান কালাউন ইবনে তাইমিয়াহ্‌কে আলেকজান্দ্রিয়ার জেল হতে বের হয়ে আসতে অনুরোধ জানালেন এবং শাইখ স্বসম্মানে স্বগৌরবে বের হয়ে আসলেন। ৮ই শাওয়াল, তিনি সুলতানের দরবারে প্রবেশ করলে, সুলতান তাঁর সাথে আন্তরিকভাবে মিলিত হলেন এবং যে সকল ফকীহ্‌গণ তাঁকে জেলে দেয়ার জন্য ফাতাওয়া দিয়েছিলেন, তাদেরও শাইখের মাঝে একটি আপোষ মীমাংসা করে দিতে চেষ্টা করলেন।

যে মানুষকে জীবনে কপটতা এবং জানা বিষয়ে সত্যে ও অসত্যের উপর মুখ বন্ধ করে চুপ থাকতে বাধ্য করে, ইবনে তাইমিয়াহ্‌র নিকট ঐ জীবনের চাইতে জেলখানাসমূহের বন্দী জীবনই বেশী প্রিয় হয়ে দেখা দিয়েছিল। শাইখের বিরুদ্ধে বিচার প্রার্থনা করা, ফকীহ্‌গণের বিচারকমণ্ডলীর ভূমিকা সর্বদাই ন্যাক্কারজনক ছিল। ইবনে তাইমিয়াহ্‌র জীবন এমন চলছিল যে, তিনি এক জেল হতে অন্য জেলে ঢুকবেন ব্যতীত বের হতে পারতেন না। একটি বিচার আবেদন শেষ না হতেই আর একটি শুরু হয়ে যেত। ফকীহ্‌গণও ছিলেন সরকারের ধামাধরা। তারা ইবনে তাইমিয়াহ্‌র বিরুদ্ধে ফাতাওয়া ও দ্রুত রায় দিয়ে সুলতানের সন্তোষ অর্জনের মাধ্যমে নৈকট্য লাভের চেষ্টা করত। অপরপক্ষে ইবনে তাইমিয়াহ্‌র উপর যত বিপদই আসত, এটার কিছুতেই তিনি মানুষের অন্তরের ইসলামী মূল্যবোধ সংশোধনের ব্যাপারে এতটুকুও নিরাশ হতেন না। বরং তিনি তাঁর সঙ্গী সাথীদেরকে এ বলে সান্ত্বনা দিতেন, "আমার শত্রুগণ আমার সাথে যেরূপ ব্যবহারই করুক না কেন, আমার বুকের বাগান আমি যেখানেই যাব, সেখানেই সেটা আমার সঙ্গে সাথী। যদি তারা আমাকে জেলে রাখে, তাহলে সেটা আমার জন্য একটু নিরিবিলির ব্যবস্থা

Contents

হল। আর যদি আমাকে এক দেশ হতে অন্য দেশে, এক কারাগার হতে অন্য কারাগারে নিয়ে যায়, তাহলে সেটা আমার জন্য সফর স্বরূপ হবে। আর যদি তারা আমাকে হত্যা করে, তাহলে সেটা হবে আল্লাহর পথে আমার শাহাদাত। নিশ্চয়ই আমার বুকে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ্ তথা আদর্শ রয়েছে।"

মুসীবাতের চূড়ান্ত পর্যায় :

শাইখের কিছু সিদ্ধান্ত, মতবাদ ও ধারণার কারণে ৭২৬ হিজরীতে যে ঘটনাটি ঘটেছিল, সেটাই ছিল তাঁর উপর পতিত সর্বশেষ বিপদ। ৭২৬ হিজরীর ১০ই শা'বান, রোজ শুক্রবার, দামেস্কের জামে মাসজিদে সুলতানের একটি ফরমান পাঠ করা হয়, যা শাইখকে ফাতাওয়া দিতে নিষেধ করে ও তাঁকে বন্দী করতে আদেশ দেয়। এতে ইবনে খুত্বাইবি দামেস্কে উপস্থিত হন ও সুলতানের শাহী ফরমান সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন।

এসব শ্রবণে ইবনে তাইমিয়াহ্ বললেন : "আরে, আমিতো ঐ ফরমানেরই অপেক্ষা করছিলাম। আসলে তাতে সীমাহীন লাভ, বড় ধরনের সফলতা রয়েছে। তখন শাইখ স্বয়ং বন্দী অবস্থায় দূর্গের ফটকের ভিতরে প্রবেশ করলেন। উক্ত মাসের মাঝামাঝিতে রোজ বুধবার, বিচারপতি সাহেব ইবনে তাইমিয়াহ্র অসংখ্য সাথী ও শিষ্যদেরকে আটক করার আদেশ দিলেন এবং তাদের এক দলকে শাস্তি স্বরূপ পথে-ঘাটে-হাটে-বাজারে প্রদর্শনীর জন্য পাঠিয়ে দেয়া হল, যেন অমানুষিকভাবে প্রতিশোধ নেয়া হয়।

ইমাম তাইমিয়াহ্ এভাবে দু'বৎসর ও আরো কয়েক মাস জেল হাজতে কাটান। কিছু সংখ্যক লোক (যারা মনে যা চায়, তাই করে) তাঁকে বন্দী করার জন্য ফাতাওয়া দেয় এবং তাদের পুরোধা ছিলেন মালিকী মাযহাবের কাজী আল-আখ্নায়ী'।

এবার তাঁকে বন্দী করার কারণ ছিল, তিনি মুসলিমগণের 'আকীদাহ্ ও বিশ্বাসসমূহকে সাধারণ মানুষের মাসজিদ ও আউলিয়াদের কবরস্থানের যিয়ারাতের জন্য ভ্রমণ বাহন ও পাথেয় সংগ্রহ ও সেটার ব্যবস্থা করার ব্যাপারে পরিশুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর শত্রুগণ একেই উপযুক্ত সুযোগ মনে করে, বড় ধরনের ফঁন্দি এঁটেছিল এবং তাঁর ফাতাওয়ার অনেক শব্দ রদবদল করে, তিনি যা বলেননি, ঐরূপ অনেক কিছু তাঁরা এ বলে প্রচার করে, তাঁর বিরুদ্ধে অনেক অপবাদের ঝড় তোলে; তাতে সাধারণ মানুষ খুবই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। আর সেটা কোন অসম্ভব ব্যাপারও ছিল বা অসম্ভব মনেও করা যায় না। কেননা এরূপ ষড়যন্ত্র তো যুগে যুগে ক্ষমতাসীনদের যুল্মের উপকরণ হয়ে আসছে যা দ্বারা এ সকল উৎসর্গ প্রাণ উলামা কর্মীগণের উপর যুল্ম করেছে, যারা কপটতা করেননি, লোক দেখানোর উপকরণাদির প্রতিও ভরসা করেননি অথবা সরকারী যুল্ম নির্যাতন হতে মুক্তির জন্য কোনরূপ তোষণনীতির অবলম্বন করেননি। আসলে ইবনে তাইমিয়াহ্ কবরসমূহের যিয়ারাত নিষেধ করেননি। ঐরূপ কিছুই বলেননি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রওযা মুবারাক যিয়ারাতও নিষেধ করেননি। যিনি এ বিষয়ে স্বীয় অনুধাবনকে বিশুদ্ধ করতে আগ্রহী, তার জন্য ইবনে তাইমিয়াহ্র ফাতাওয়া মওজুদ (বর্তমান) রয়েছে।

আসল বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসে বর্ণিত তিনটি মাসজিদ (আল-মাসজিদুল হারাম মাক্কাহ্, আল-মাসজিদুল আক্সা যেরুজালেমে ও আল মাসজিদুন্ নববী মাদীনাহ্) এর জন্য ছাড়া অন্য কোন মাসজিদ বা স্থানের উদ্দেশে (বেশী পুণ্যের বাসনায়) ভ্রমণ বাহন করতে নিষেধ করেছেন বৈ আর কিছুই নয়। لا تشدوا الرِّحال إلا إلى ثلاثة مسَاجد ঐ বিষয়ে ইবনে তাইমিয়াহ্র নিকট এসব প্রমাণাদি আছে, যা তাঁর বিরোধীগণকে কৃষ্ণকায় কয়লাবৎ বানিয়ে ফেলবে। কিন্তু তারা এ ব্যক্তিকে বন্দী না করে, তাঁর জিহ্বাকে চুপ না করিয়ে অন্য কিছুতেই সন্তুষ্ট হবে না।

জীবনের শেষ বেলায় বেদনাদায়ক স্মৃতি :

৯ই জুমাদা আল-আখিরাহ্, রোজ সোমবার, শাইখের নিকটে জেলখানার ভিতরের যত বই পুস্তক, কাগজপত্র, দোয়াত, কলম ইত্যাদি সব কিছুই বের করে দেয়া হল এবং লেখাপড়া করা হতে বারণ করা হল। রজবের প্রারম্ভে তাঁর সকল পুস্তকাদি আদিলিয়ার বড় গ্রন্থাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেটা প্রায় ৬০ ষাট খণ্ড এবং ১৪ চৌদ্দ বান্ডেল পাণ্ডুলিপি ছিল। ফকীহ্গণ ঐগুলো দেখতে পেয়ে নিজেদের মধ্যে তা বণ্টন করে নিলেন।

ইবনে তাইমিয়াহ্র এসব আত্মিক পাথেয় সামগ্রী, যা জেলখানার একাকীত্বের একমাত্র সঙ্গী ছিল, নিষিদ্ধ করা হল। তখন তাঁর পীড়া চরম আকার ধারণ করেছিল এবং ঐ অশোভন আচরণে তাঁর মনঃপীড়া আরও বেশী বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ঐ অবস্থা বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। তাঁর পবিত্র আত্মা ৭২৮ হিজরীর ২২শে জুল-কাআদ, রোজ সোমবার, তাঁর স্রষ্টার কাছে মহা প্রস্থান করেছিল। এ ব্যক্তি অন্যান্য মহামানবের মতই স্থির বিশ্বাস ও প্রথিত মূল ঈমানের অধিকারী ছিলেন, যা তাঁর শত্রুদের গলদেশে শ্বাসরুদ্ধকারী হয়ে রয়েছিল, যেজন্য তাঁর অনুপস্থিতি ছাড়া তারা শ্বাস-প্রশ্বাস নিতেই পারছিল না এবং তাঁর চির প্রস্থানের পর ছাড়া, তাঁর জীবদ্দশায় তারা কখনও সুখী জীবন-যাপন করতে পারছিল না। অবশেষে এ মহান ব্যক্তি জেলখানাতেই ইন্তিকাল করেন।

ঐ শাইখের জানাযা ছিল আহ্মাদ বিন হাম্বালের কথার স্পষ্ট দৃষ্টান্ত : "তোমরা বিদ'আতীদেরকে বলে দাও, তোমাদেরকে ও আমাদের মধ্যে পার্থক্য হল জানাযায় উপস্থিত জনতার সংখ্যা অনুযায়ী।"

ইবনে তাইমিয়াহ্র জানাযায় এতলোক উপস্থিত হয়েছিল, যা ছিল গণনার বাইরে। ইবনুল বারজালী বলেন : "দামেস্কের অধিবাসীগণ শাইখের জানাযায় এমনভাবে একত্রিত হয়েছিলেন যে, যদি কোন মহাপরাক্রমশালী

সুলতান ও তার হিসাব রক্ষাকারী দপ্তর তাদেরকে একত্রিত করতে চায় তবুও তাঁর জানাযায় যত লোক এসেছিল, এতলোক হাযির করতে পারতেন না।” আসলে দামেস্কের সকলেই তাঁর জানাযায় এসেছিলেন।

ঐ বিষয়ে ইবনে কাসীর একটি টীকা লিখেছেন :

“যদিও ঐ ব্যক্তি (ইবনে তাইমিয়াহ্) সুলতানের আদেশ অনুসারে বন্দীকৃত অবস্থায় দুর্গের অভ্যন্তরে ইন্তিকাল করেছেন এবং অনেক ফকীহ্ ও সুফীগণ তাঁর ব্যাপারে মানুষের কাছে এমন অনেক কিছু বলে বেড়িয়েছেন যা দীনের অনুসারীগণকে নিরুৎসাহিত করে দূরে ঠেলে দেয়, দেখ, এরূপ ছিল তাদের কথা এবং তা হল তাঁর জানাযার অবস্থা। আসলে তাদের কথা ও প্রকৃত অবস্থার মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে।”

এই যে জানাযাসমূহ, এটাই আহ্লে সুন্নাহ্ ও বিদ‘আতীদের মধ্যে পৃথককারী মহা প্রাচীর।

ইতিহাসের কাছে তাঁর দিবারাত্রির যে ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘুরপাক খাচ্ছে সেটার কোনটিই লুকিয়ে নেই। ইবনে তাইমিয়াহ্র ব্যাপারে অনেক কিছুই বলা হয়েছে, যা তাঁর জন্য দোষের ছিল, যেমনভাবে তাঁর ও অন্যান্য খাঁটি বিশ্বাসীগণের বিরুদ্ধেও বলা হয়ে থাকে। অথচ ইতিহাসের স্মৃতির পাতা ওসবের কিছুই বিস্মৃত হয় না, আজীবন সংরক্ষণ করে। এই দেখুন, ইবনে তাইমিয়াহ্র রেখে যাওয়া উত্তরাধিকার সম্পদ, আর এগুলো তাঁর মতামত ও সিদ্ধান্তসমূহ, এসবই ঐ সকল ব্যক্তিদের জন্য মুখরোচক খাদ্য, যাদের কাছে বিপদাপদ এসে আত্মসমর্পণ করেছে এবং তাদের অবিচলতা সত্য বলে বিবেচিত হয়েছে।

অন্যান্য মহাপুরুষদের বেলায় যা ঘটেছে, ইবনে তাইমিয়াহ্র বেলায়ও তাই ঘটেছে। ইবনে তাইমিয়াহ্কে যেজন্য ভর্ৎসনা করা হয়েছে, অন্যান্যদেরকেও হয়তঃ সেজন্যই ভর্ৎসনা করা হয়ে থাকবে। কিন্তু ফেনারাশি শীঘ্রই মিলিয়ে যাবে, আর মানুষের জন্য যা উপকারে আসবে,

Contents

সেটাই শুধু পৃথিবীতে জমা হবে .... আর আল্লাহর সৃষ্টি জগতে তাঁর এটাই বিধান।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের সৃষ্ট জগত সংসারের মধ্যে এভাবেই কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। যা সেভাবেই নির্ধারিত হয়েছিল। শত শত বছর পর আজও যার স্মৃতি ও দীনী কল্যাণময় কাজসমূহ ক্ষণস্থায়ী এ পৃথিবীকে আলোকিত করে চলছে। রাব্বুল 'আলামীন তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

সুতরাং গতকাল যা প্রবাহিত হয়েছে, তা আজ এবং আগামীকাল ও যথারীতি প্রবাহিত হতে পারে, যাতে ব্যক্তি ইতিহাস হতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

হে আল্লাহ! ইবনে তাইমিয়াহ্‌কে দয়া করুন এবং তাঁকে ইসলাম ও মুসলিমগণের পক্ষ হতে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ হতে নিষেধ

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ হতে নিষেধ– এটা এমন একটি বিষয়, যেজন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর গ্রন্থসমূহ অবতীর্ণ করেছেন এবং তাঁর রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন, সেটা দীনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

নিশ্চয়ই আল্লাহর আদেশ তথা বিধান হয়তঃ সংবাদ দান করা, বা সংগঠন করা। সংবাদ দান করা– তাঁর সত্ত্বা ও তাঁর সৃষ্টি জগৎ সম্পর্কে। যেমন– একত্ববাদ– আল্লাহকে অদ্বিতীয় বলে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা আর ঐসব বিষয়সমূহ, যাতে থাকবে আল্লাহর দেয়া প্রতিশ্রুতি, সতর্কবাণী ও শাস্তির ধমকি। আর সংগঠন করা হল– আদেশ দান করা, নিষেধ করা বা এমন কোন কিছুর শিক্ষা দেয়া, যা করা বা না করায় কোনরূপ দোষগুণ নেই। এ বিষয়টি, যেমন হাদীসের গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে : "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ্"– (আল-ইখলাস) পবিত্র কুরআনের ১/২ অংশের সমান হবে।"

(আবূ দাউদ : কিতাবুল বিত্‌রি, বাবু ফি সূরাতি আল-সামাদ, হা: নং– ৫৩, পৃ: ১৫২; আত্-তিরমিযী : ১১/২২,২৩, বাবু সাওয়াবুল কুরআন; আন্-নাসায়ী : ২/১৭০০, কিতাবুল আল-ইফ্‌তিতা-হু; ইবনে মাযাহ্ : কিতাবুল আল-আদাব, বাবু সাওয়াবুল কুরআন, পৃ: ১২৪৪, হা: নং– ৫৭৮৮; আল-মুওয়াত্তা : কিতাবুল-আল-সালাত, পৃ: ১৬৬, হা: নং– ৩৩২)

যেহেতু আল্লাহর একত্ববাদ সংশ্লিষ্ট করে। কুরআনে তিন ধরনের বর্ণনা এসেছে : ঐসব বিষয় (নাবী ও অতীত জাতিসমূহের বিবরণ), আল্লাহর একত্ববাদ ও আদেশ।

পুতঃপবিত্র মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আমাদের প্রিয় নাবী ﷺ-এর বিশ্লেষণে বলেছেন :

﴿يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ

Contents

الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ؕ ﴾

"তিনি সৎকাজের আদেশ করেন এবং অসৎকাজ হতে নিষেধ করেন। মানব জাতির জন্য সকল উত্তম ও পবিত্র জিনিসগুলো বৈধ করেন এবং খারাপ বিষয়গুলো হারাম করেন"– (সূরা আল-আ'রাফ ৭ : ১৫৭)। সেটাই তাঁর রিসালাতের পূর্ণ বর্ণনা। তিনিই তো ﷺ সে সত্ত্বা যাঁকে স্বয়ং আল্লাহ নিজ ভাষায় সৎকাজের আদেশ দিয়েছেন, সকল অসৎকাজ কর্ম হতে বারণ করেছেন, সব উত্তম বিষয় হালাল করেছেন, অনুত্তমগুলো হারাম করেছেন। এজন্যই তিনি বলেছেন :

"নিশ্চয়ই আমি সকল পুতঃ চরিত্রাবলীর পরিপূর্ণতা সাধনের জন্যই প্রেরিত হয়েছি।" (মুওয়াত্তা ইমাম মালিক : ৫/২৫১ এবং তাতে আছে إنما بعثتُ لأتمم مكارمَ الأخلاقِ; ইবনে হাম্বাল : ২/৩৮১)

সম্মিলিতভাবে বুখারী ও মুসলিমের বর্ণিত হাদীসটিতে বলেছেন : "আমার ও অন্যান্য নাবীগণের দৃষ্টান্ত, যেমন কোন এক ব্যক্তি একটি বাড়ী তৈরী করেছে এবং সম্পূর্ণ করেছে শুধু একখানা ইটের স্থান পূরণ হয়নি, এমতাবস্থায় মানুষ সেটার প্রদক্ষিণকালে আশ্চর্য হয়ে বলত : হ্যাঁ, যদি ঐ ইটখানার জায়গাটি খালি না থাকত! আর আমিই হলাম ঐ শেষ ইটখানা।" (বুখারী : কিতাবুল আল-মানাকিব এ বাবু খাতামিন্ নাবিইয়ীন, ৪/২৬১; মুসলিম : ১/১৭৯)

আমাদের দীন প্রত্যেকটি সৎকাজের আদেশ ও প্রত্যেকটি অসৎকাজ হতে নিষেধকে সম্পৃক্ত করে

আল্লাহ তাঁর দ্বারাই আল-দীন যা সকল সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ হতে নিষেধ, প্রত্যেকটি উত্তম জিনিসকে বৈধ এবং খারাপকে অবৈধ করেছেন, ইত্যাদিকে পরিপূর্ণ করেছেন।

আল্লাহর শেষ নাবীর পূর্বে যে সকল নাবীগণ ছিলেন তাঁরা তাঁদের উম্মাতের উপর কতক বৈধ জিনিসকে অবৈধ ঘোষণা করতেন– যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেছেন :

﴿ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ﴾

"অতএব ইয়াহূদীদের যুল্মের কারণে তাদের উপর এমন কিছু জিনিস হারাম করে দিয়েছি যা তাদের জন্য হালাল ছিল।" (সূরা আন্-নিসা ৪ : ১৬০)

হয়তো বা তাদের উপর সকল খারাপ বিষয় হারাম করা হয়নি, যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেছেন :

﴿ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ﴾

"প্রত্যেকটি খাদ্যদ্রব্যই ইসরাঈল বংশীয়দের জন্য হালাল ছিল, শুধু ঐ জিনিসটি ছাড়া, যা পবিত্র তাওরাত অবতীর্ণের পূর্বে ইস্‌রাঈল [ইয়া'কূব ('আঃ)] স্বয়ং নিজের উপর অবৈধ করে নিয়েছিল।"

(সূরা আ-লি 'ইমরান ৩ : ৯৩)

কোন খারাপ জিনিস অবৈধ করা : অসৎকাজ হতে নিষেধ করারই অন্তর্গত। যেমনভাবে পবিত্র জিনিসটি বৈধ করাও সৎকাজে আদেশের

অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। কেননা উত্তম জিনিসকে অবৈধ করা, আল্লাহ যা করতে নিষেধ করেছেন, তারই অন্তর্ভুক্ত। এমনিভাবে সকল সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করা– আল্লাহর রাসূলকে ছাড়া যা পূর্ণ হয়নি, যাঁকে দ্বারা আল্লাহ তা'আলা উন্নত চরিত্রের পরিপূর্ণতা সাধন করেছেন– সৎকাজের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন ইরশাদ করেছেন :

﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ج﴾

"আমি আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করলাম, তোমাদের উপর আমার নিয়ামাত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য 'দীন ইসলাম'কে একমাত্র ধর্ম হিসেবে মনোনীত করলাম।"

(সূরা আল-মায়িদাহ্ ৫ : ২১)

আল্লাহ আমাদের জন্য দীনকে পরিপূর্ণ করেছেন, আমাদের উপর তাঁর অনুগ্রহ পুরো করেছেন এবং দীন ইসলামকে আমাদের দীন (ধর্ম) হিসেবে মনোনীত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবীকে যে বিশেষণে বিশেষিত করেছেন উম্মাতকেও সে গুণে গুণান্বিত করেছেন এবং একই দায়িত্ব দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন :

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾

"তোমরাই হচ্ছো উত্তম জাতি, যাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে, তোমরা সৎকাজে আদেশ করবে এবং অসৎকাজ হতে নিষেধ করবে, তদুপরি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে।"

(সূরা আ-লি 'ইমরান ৩ : ১১০)

আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন আরও 'ইরশাদ করেছেন :

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾

"আর মু'মিন পুরুষ ও নারীগণ একে অপরের বন্ধু, তারা সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎকাজ হতে নিষেধ করে।" (সূরা আত্-তাওবাহ্ ৯ : ৭১)

এজন্যই আবূ হুরাইরাহ্ (রাযি.) বলেছেন : "তোমরা মানুষের কল্যাণের জন্য উত্তম মানুষ। তোমরা তাদেরকে তাদের গলদেশসমূহে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় নিয়ে আসবে, শেষ পর্যন্ত তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।" *

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন ঃ এ জাতি মানুষের কল্যাণের জন্য সর্বোত্তম জাতি। অতএব তারা তাদের জন্য সবচাইতে বেশী ফলপ্রদ, উপকারী, সবচাইতে দয়ার্দ্র। কেননা তারা গুণ-সংখ্যা ও পরিমাপের দিক হতে সকল উত্তম ও ভাল বিষয় পরিপূর্ণ করেছে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করার মাধ্যমে। তারা প্রত্যেকেই প্রত্যেককে প্রতিটি সৎকাজের আদেশ করেছে, অর্থ ও প্রাণের বিনিময়ে আল্লাহর পথে জিহাদের তথা সংগ্রামের মাধ্যমে সেটা প্রতিষ্ঠিত করেছে। এটাই হল সৃষ্টি জগতের জন্য পরিপূর্ণ উপকার।

অন্য সকল জাতির প্রত্যেকে প্রত্যেককেই সৎকাজেরও আদেশ দেয়নি, অসৎকাজ হতেও নিষেধ করেনি, এ সুবাদে জিহাদ বা সংগ্রামও করেনি। আর যারা জিহাদ করেছে, যেমন ইস্রাঈল বংশ– তাদের সাধারণ

---

* এ হাদীসখানা আবূ হুরাইরাহ্ (রাযি.) পর্যন্ত মাওকূফ অবস্থায় বুখারী শাব্দিকভাবে হুবহু উল্লেখ করেছেন–

تأتون بهم فى السّلاسل فى أعناقهم حتى يدخلوا الجنّة

Contents

জিহাদ ছিল, স্বদেশ হতে শত্রুদেরকে বিতাড়িত করা। যেমন– অত্যাচারী-অনাচারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়ে থাকে। অথচ যাদের সাথে যুদ্ধ করা হয়েছে তাদেরকে উত্তম বিষয় ও হিদায়াতের পথে আহ্বান করার জন্য বা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করার জন্য উক্ত জিহাদ ছিল না। যেমন– মূসা ('আ.) তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন :

﴿يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِيْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ۞ قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ صلى ق وَاِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا ج فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ ۞ قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ج فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ ج وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۞ قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَآ اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ﴾

"হে আমার জাতি! তোমরা ঐ পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ কর, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য বরাদ্দ করেছেন। আর তোমরা তোমাদের পিছন দিকে ফিরে এসো না, তা না হলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। তারা বলল, হে মূসা! নিশ্চয়ই ওখানে এক শক্তিশালী জাতি রয়েছে, তারা যে পর্যন্ত ওখান হতে সরে না যাবে, সে পর্যন্ত আমরা ওখানে প্রবেশই করতে পারব না। অতএব আপনি আর আপনার প্রতিপালক গমন করুন এবং (শত্রুর মুকাবিলায়) যুদ্ধ করুন। আমরা এখানেই বসে রইলাম।"

(সূরা আল-মায়িদাহ্ ৫ : ২১-২৪)

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেছেন :

﴿ اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى ۘ اِذْ قَالُوْا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا ؕ قَالُوْا وَمَا لَنَآ اَلَّا نُقَاتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَآئِنَا ؕ ﴾

"তুমি কি মূসার পরবর্তী বানী ইস্‌রাঈল বংশের নেতৃস্থানীয়দেরকে দেখেছ? যখন তারা তাদের নাবীকে বলেছিল– আমাদের জন্য একজন বাদশাহ্ প্রেরণ করুন, আমরা (তার সাথে থেকে) আল্লাহর পথে জিহাদ করব। তিনি বললেন, যখন তোমাদের উপর যুদ্ধ অনিবার্য করে দেয়া হবে, তখন কি তোমরা এমন করবে যে, তোমরা যুদ্ধ করবে না? তারা (জবাবে) বলল, আমাদের এমনকি হয়েছে যে, আল্লাহর পথে যুদ্ধই করব না? অথচ আমাদেরকে আমাদের বাড়ীঘর হতে বের করে, সন্তানাদি হতে দূরে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে।" (সূরা আল-বাকারাহ্ ২ : ২৪৬)

তারা যুদ্ধের কারণ দর্শাল যে, তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ী ও সন্তানাদি হতে দূরে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও তাদের প্রতি যে আদেশ হয়েছিল (তা অমান্য করার কারণে), সেজন্য শাস্তি স্বরূপ তাদের যুদ্ধলব্ধ মালামাল তাদের জন্য বৈধ করা হয়নি এবং তারা ইয়ামান দেশও পদানত করতে পারেনি।

এ কথা সর্বজনবিদিত যে, আমাদের পূর্বে মু'মিন হিসেবে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি ছিল ইস্‌রাঈল বংশ। যেমন– বুখারী ও মুসলিমের একমত হওয়া একটি হাদীসে ইবনে 'আব্বাস (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে, নাবী ﷺ বলেছেন :

"নাবীগণকে তাঁদের উম্মাতসহ গতরাত্রে আমার সামনে পেশ করা হয়, এমতাবস্থায় (দেখলাম), একজন নাবী যাচ্ছিলেন তাঁর সাথে একজন লোক, আর একজন নাবী যাচ্ছিলেন তাঁর সাথে দু'জন লোক, আর একজন নাবী যাচ্ছিলেন তাঁর সঙ্গে একদল লোক, আবার কোন নাবী যাচ্ছেন অথচ তাঁর সাথে কেউই নেই। অথচ আমি বহু সমাবেশ দেখেছি।"

অন্য আর একটি বর্ণনায় আছে : فإذا الظراب ممتلئة بالرجال

"আরে লোকে মাঠ ভর্তি! বললাম, তারা কি আমার উম্মাত? উত্তর হল– তারা বানী ইস্‌রাঈল (ইস্‌রাঈল বংশ); কিন্তু এদিকে ঐদিকে (ডানে বামে) চেয়ে দেখুন। দেখলাম বহু লোকের সমাবেশ, আসমানের কিনারা পর্যন্ত আড়াল করে ফেলেছে! বলা হল : তারাই আপনার উম্মাত। তাদের সাথে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসেবে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে। অতঃপর লোকজন আলাদা আলাদা হয়ে গেল। তিনি তাদের নিকট আর বর্ণনা করলেন না।

অতঃপর নাবী ﷺ-এর সঙ্গীগণ পরস্পর বলতে লাগলেন : আমরা তো আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপনের যুগে জন্মলাভ করেও তাঁর রাসূলের কথা অনুযায়ী ঈমান এনেছি, কিন্তু আমাদের ঐ সন্তানেরা? এ কথা নাবী ﷺ-এর কানে পৌঁছলে তিনি বললেন : যারা চিকিৎসার জন্য আগুনের দাগ নেয়নি, তাবীজ-কবজ ব্যবহার করেনি এবং কোন কিছু দেখে শুভাশুভ বিশ্বাস করে 'ফাল' গ্রহণ করেনি, তারাই তাদের প্রতিপালকের প্রতি ভরসা করে থাকেন। এটা শ্রবণ করে 'উকাশাহ্ বিন মুহ্‌সিন দাঁড়িয়ে আরজ করলেন : আমি কি ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত? ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! তিনি বললেন : হ্যাঁ, (এ দৃশ্য দেখে অন্য আরও একজন দাঁড়িয়ে বলল : আমিও কি তাদের অন্তর্ভুক্ত? এতে নাবী ﷺ বললেন : 'উকাশাহ্ তোমাকে ছাড়িয়ে আগে চলে গিয়েছে। (ইবনে হাম্বাল : ১/৪০২, ৪০৩; বুখারী : ১০/২১১)

এ জাতির সর্বসম্মত রায় বা মতটি শারী'আতের জন্য প্রমাণ বা দলীল। কেননা স্বয়ং আল্লাহ বলেছেন : তারা প্রতিটি ভাল ও সৎকাজের জন্য আদেশ দেয় ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করে। তারা যদি কোন হারামকে হালাল করে, কোন একটি ওয়াজিবকে বাদ দেয়, কোনও হালালকেই হারাম করে, অথবা আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টি জগৎ সম্পর্কে কোন ভুল তথ্য পরিবেশন করার ব্যাপারে একমত হয়, তাহলে সেটা তাদের দ্বারা সৎকাজ হতে নিষেধ করা ও অসৎকাজের আদেশ দেয়া হয় বলে গণ্য করা হবে। অথচ অসৎকাজের আদেশ ও সৎকাজ হতে নিষেধ করা, কোনক্রমেই তা ভাল কথা নয় আর উপযুক্ত কাজও নয়। আসলে আয়াতটির মর্মকথা হচ্ছে, জাতি যারা আদেশ করবেন, সেটা সৎকাজের অন্তর্ভূক্ত হবে না। আর যা হতে নিষেধ করবে না সেটাও অসৎকাজের অন্তর্গত হবে না। যখন এ জাতি সৎকাজের আদেশদাতা ও অসৎকাজ হতে নিষেধকর্তা হবে, তখন কিরূপে এটা সমীচীন হবে যে, তাদের সকলেই অসৎকাজের আদেশ দিবে এবং সৎকাজ হতে নিষেধ করবে?

প্রত্যেকটি সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করা অপরিহার্য

জাতির সৎকাজে আদেশ দান ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করাকে ওয়াজিব-ই-কিফাইয়াহ ধার্য করে এ বলে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা 'ইরশাদ করেছেন :

﴿وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ﴾

"তোমাদের মধ্য হতে এমন একটি জাতি হওয়া উচিত যারা সকল ভাল তথা উত্তম বিষয়ের দিকে আহ্বান করবে, সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজ হতে নিষেধ করবে, আসলে তারাই হচ্ছে সফলকাম সম্প্রদায়।" (সূরা আ-লি 'ইমরান ৩ : ১০৪)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা যখন, তাদের দ্বারা সৎকাজের আদেশ সংঘটিত হবে বলে সংবাদ দিয়েছেন, তখন তাতে এমন কোন শর্ত নেই যে, আদেশকারীর আদেশ ও নিষেধকারীর নিষেধ, বিশ্বের প্রত্যেকটি (প্রাপ্তবয়স্ক) ব্যক্তির নিকটে পৌঁছাতে হবে। যেহেতু আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে কোন শর্ত নেই, সেহেতু এটার উপ-ধারার বিষয়গুলোতে সেটা শর্ত হবে কিভাবে? কিন্তু শর্তটি হল প্রাপ্তবয়স্ক লোকগণের নিকট ঐ আদেশ ও নিষেধ যেন পৌঁছে এ সুবিধাটি তারা পেতে সক্ষম হয়।

অতঃপর যদি তারা গাফলতি করে, তাহলে তার কর্মীর পূর্ণ ব্যবস্থা নেয়া সত্ত্বেও সেটা তাদের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হয়ে না উঠে, তাহলে ঐ গাফলতিটা তাদের পক্ষ হতেই হয়েছে বলে ধরা হবে; কর্মীর পক্ষ হতে নয়।

অনুরূপভাবে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করা নির্দিষ্ট করে প্রত্যেকের উপর বর্তাবে না; বরং পবিত্র কুরআনের প্রমাণ অনুসারে সেটা ওয়াজিব-ই-কিফাইয়াহ্।

জিহাদও ঠিক অনুরূপভাবে ওয়াজিব-ই-কিফায়াহ্। অতএব সেটার দায়িত্বশীল যখন সেটা সম্পাদনে ব্রতী হবেন না, তখন সকল সামর্থ্য ব্যক্তিগণ তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী ঐ দায়িত্ব পালন না করার দোষে সমভাবে দোষী হবেন। সুতরাং এটা স্পষ্টভাবেই বুঝা গেল যে, প্রতিটি মানুষের উপরই তার শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী ঐ দায়িত্ব বর্তাবে। যেমন– নাবী ﷺ হাদীসে বলেছেন :

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان.

"তোমাদের মধ্যে যে কোন একটি অসৎকাজ (হতে) দেখবে, সে যেন তাকে তার হাত দ্বারা প্রতিহত করে। তবে যদি সে ঐরূপ করতে অক্ষম হয়, তাহলে কথা দ্বারা যেন তাকে প্রতিহত করে, যদি এরূপও করতে অক্ষম হয়, তাহলে যেন অন্তর দিয়ে তাকে ঘৃণা করে। আর সেটা হচ্ছে সবচাইতে দুর্বল ঈমান।"

(বুখারী : কিতাবুল 'ইল্‌ম; মুসলিম : কিতাবুল ঈমান; আবূ দাঊদ : বা-বুল আম্‌রি ওয়ান্নাহ্‌ই; ইবনে মাযাহ্ : কিতাবুল ফিতান, বাবুল আম্‌রি বিল মা'রূফি ওয়ান্নাহ্‌ই আনিল মুনকার; আত্-তিরমিযী : কিতাবুর রাইয়্যাত, আল-নাসায়ী : কিতাবুল ঈমান; আল-দারিমী : কিতাবুর রুইয়্যা; ইবনে হাম্বাল ২/৪)

যদি বিষয়টি ঐ রকমই হয়, তাহলে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা, যা পরিপূর্ণ করা হয়ে থাকে জিহাদের মাধ্যমে সেটা একটি বৃহত্তম সৎকাজ; যার জন্য আমরা আদিষ্ট হয়েছি। তার জন্যই বলা হয়েছে– তোমার আদেশ যেন সৎকাজের জন্য হয় এবং অসৎকাজে তোমার নিষেধ করাও যেন সৎ হয়।

যখন এটা সর্বোত্তম ওয়াজিব এবং পছন্দনীয় কাজ, সুতরাং এ ওয়াজিবসমূহ (অপরিহার্য) ও মুস্তাহাবগুলোর সুফল তাদের (প্রয়োগের কারণে) অপকারের চাইতে বেশী ভারি হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যেহেতু এটা সহকারেই রাসূলগণকে পাঠানো হয়েছিল এবং আস্‌মানী গ্রন্থসমূহ অবতীর্ণ করা হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা কখনও ফাসাদ বা অনাসৃষ্টি পছন্দ করেন না। উপরন্তু আল্লাহ যার আদেশ করবেন, তা উত্তমই হবে। আল্লাহ তা'আলা সৎকাজ ও সৎকর্মীদের প্রশংসা করে বলেছেন :

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾

"আর যাঁরা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে।"

আবার ফাসাদ ও ফাসাদকারীদের কুৎসা করেছেন একাধিক স্থানে। অতএব যেখানে আদেশ ও নিষেধের উপকার হতে সেটার অপকারই মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়ে, তখন সেখানে সেটা, আল্লাহ যে সকল বিষয়ে আদেশ করেছেন তার অন্তর্ভুক্ত হয় না। আর যদি ঐ রকম হয়ে যায়, তবে যেন ওয়াজিবই ছাড়া হয়ে গেল; আর নিষিদ্ধ কাজই করা হল। এরূপ ক্ষেত্রে মু'মিনের কর্তব্য হল আল্লাহর বান্দাহ্‌দের ব্যাপারে আল্লাহকে পূর্ণ ভয় করা, তাদেরকে হিদায়াত করা তার দায়িত্ব নয়। এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলার কথারই অর্থ বহন করে :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۚ ﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমরা যদি সৎপথের যাত্রী হয়েই থাক, তাহলে যারা পথ ভুলে গিয়েছে তারা তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না"– (সূরা আল-মায়িদাহ্ ৫ : ১০৫)। দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সৎপথের সন্ধানকারী পূর্ণতা লাভ করে থাকে।

সুতরাং মুসলিম ব্যক্তি যদি তার করণীয় কাজ তথা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করতে থাকে, যেমন– অন্যান্য ওয়াজিব কাজগুলো আদায় করে থাকে, তবে পথভ্রষ্ট লোকদের পথভ্রষ্টতা তার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।

অসৎকাজ হতে নিষেধ করা কখনও শক্তি দ্বারা হতে পারে, আবার কখনও বা রসনার দ্বারা, আবার কখনও শুধু অন্তরের ঘৃণা দ্বারাই হয়ে থাকে। অন্তর দ্বারা সেটা করা সর্বাবস্থায়ই ওয়াজিব হবে। যেহেতু সেটা করতে কোনই ক্ষতি নেই। যে ব্যক্তি এতটুকু ঘৃণাও পোষণ করে না সে আসলে মু'মিনই নয়। নাবী ﷺ-এর হতে এরূপই বুঝা যায়। তিনি (ﷺ) বলেছেন : ذلك أضعف الإيمان "আর সেটা হল সবচাইতে দুর্বল ঈমান।" এবং আরও বলেছেন– "সেটার পর সরিষা পরিমাণ ঈমানও আর নেই।"*

একদা ইবনে মাস'ঊদ (রাযি.)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল : "জীবিতগণের মধ্যে মৃত কোন ব্যক্তি?" উত্তরে তিনি বললেন : "যে ব্যক্তি সৎকাজ কি তা জানে না এবং অসৎকাজকে যে ঘৃণা করে না। এ ব্যক্তি সেই যে জন ফিত্‌নায় পতিত হয়েছে। যাকে قلبه كالكوز مجخيا বলে পরিচিত করা হয়েছে। তার অন্তর বক্র।" (মুসলিম : কিতাবুল ঈমান, বাবু রফ্‌ইল আমানাত ওয়া আরদুল ফিতান্ আলাল কুলব; ইবনে হাম্বাল : ৫/৩৮৬)

সহীহ রিওয়ায়াতে দু'গ্রন্থে হুযাইফাহ্ বিন আল-ইয়ামান (রাযি.) বর্ণিত হাদীসে আছে–

تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير

"অন্তরসমূহের উপর বিছানা বিছাবার মতই ফিতনাকে পেশ করা হবে।"

---

* কোন অসৎকাজকে মনে মনে শুধু ঘৃণা করা দুর্বল ঈমান, আর এটুকুও যখন করবে না তখন বুঝা যাবে যে, অন্তরে ঈমান আর অবশিষ্ট নেই। (সম্পাদক)

Contents

আদেশ ও নিষেধের ক্ষেত্রে মানুষ দু'শ্রেণী

এখানেই মানুষের দু'টি দলই ভুল করে থাকে। প্রথম দল : তাদের উপর আদেশ ও নিষেধের যে দায়িত্ব, এ আয়াতটির ব্যাখ্যা হিসেবে অবহেলা করে ছেড়ে দিচ্ছে। যেমন প্রথম খলীফা আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রাযি.) তাঁর এক ভাষণে বলেছিলেন : হে লোক সকল! তোমরা এ আয়াতটি পড়ে থাক–

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ ۚ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের স্ব-স্ব হিদায়াতের দায়িত্ব তোমাদের নিজেদের উপর, তোমরা যদি সৎপথপ্রাপ্ত হও তাহলে যারা বিপথগামী হয়েছে তারা তোমাদেরকে ক্ষতি করতে পারবে না"– (সূরা আল-মায়িদাহ্ ৫ : ১০৫)। অথচ তোমরা সেটার সদ্ব্যবহার করছ না। আমি নাবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি "নিশ্চয়ই মানুষ যখন অসৎকাজ চলতে দেখবে, অথচ সেটাকে প্রতিহত করবে না, এটা বেশী দূরে নয় যে, আল্লাহ তা'আলা ঐ কাজের দায়ে সকলকেই সাধারণভাবে শাস্তি দিবেন*।"

---

* হাদীসটি উল্লেখিত ঐ আয়াতের ব্যাখ্যায় পুরোপুরি এসেছে– (ক) আত্-তাবারী : ১১/১৩৭; (খ) ইব্‌নে কাসীর : ২/৬৬৭; (গ) ইবনে মাযাহ্ : দেখুন- কিতাবুল ফিতান باب قوله تعالى يايها الذين أمنو عليكم أنفسكم তাতে কিছু সংখ্যক মানুষের ধারণা অনুযায়ী সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করা ছেড়ে দিবার কোন প্রমাণ নেই। ইমাম তিরমিযী (রহ:) বলেছেন : আবূ উমাইয়্যাহ্ হতে বর্ণিত– আমি আবূ সা'আলাবাকে জিজ্ঞেস করে বললাম– এ আয়াতে আপনি কেমন করেন? তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র শপথ! তুমি এমন লোকের কাছেই প্রশ্ন করেছ, যিনি সেটার উত্তর জ্ঞাত আছেন। আমি নাবী ﷺ-কে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছি, তিনি বলেছেন : "বরং তোমরা নিজেরাই নিজেদের দ্বারা সৎকাজে আদিষ্ট হও এবং অসৎকাজ হতে নিজেরাই বিরত থাক। যখন দেখবে কৃপণতার অনুসরণ করা হচ্ছে, প্রবৃত্তির অনুসরণ চলছে, পাপ কাজ চলছে, 'আলিমগণ স্বীয় রায় নিয়েই খুশী তখন তোমরা নিজেদের ভাবনা নিজেরাই ভাববে...।" (আল-হাদীস)

আর দ্বিতীয় দলটি– যারা জিহ্বা বা হাত দ্বারা মোটকথা সৎকাজে আদেশ দিতে ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করতে চায়, কোন প্রয়োজনীয় জ্ঞান, সহনশীলতা বা ধৈর্য ছাড়াই এবং সেটার কোন্‌টি কোথায় চলবে, আর কোথায় চলবে না, কোন্‌টি সে করতে পারবে, আর কোন্‌টি সে করতে পারবে না, সেদিকে তার লক্ষ্য নেই। যেমন– আবূ সা'আলাবাহ্ আল্-খাশানী বর্ণিত হাদীসে আছে, আমি সেটা (ঐ আয়াতটি) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করেছিলাম, এতে তিনি বলেছিলেন :

"বরং তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অসৎকাজ হতে নিজেদেরকে নিজেরাই নিষেধ করবে। যখন দেখবে এমন কৃপণতা, যা অন্যেরা অনুসরণ করছে এবং অনুসৃত প্রবৃত্তি, প্রভাব বিস্তারকারী পার্থিব ঐশ্বর্য ও প্রত্যেক 'আলিম ব্যক্তি স্ব-স্ব রায় নিয়েই খুশি হচ্ছে এবং এমন সব অশ্লীল কর্ম কাণ্ড ঘটতে দেখবে যা ঠেকাবার মত তোমার কোন শক্তি নেই, এমতাবস্থায় 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' ভিত্তিক নিজে নিজেকেই রক্ষা করবে। এমন সময় হলে সর্বসাধারণের চিন্তা-ভাবনা করার তোমার সুযোগই থাকবে না, পারবেও না, কাজেই সেটা বাদ দিও। কেননা তোমার সামনে ধৈর্যের এমন দিন আসবে (তখন কঠিন পরীক্ষা হবে) ঐ দিনগুলোতে ধৈর্যের সাথে ঈমান নিয়ে টিকে থাকা জ্বলন্ত অঙ্গার হাতের মুঠিতে ধারণের মতোই কঠিন হবে। ঐ কঠিন দিনগুলোতে সৎকাজের কর্মীদের সাওয়াব হবে তার সমতুল্য 'আমালকারী পঞ্চাশ জন লোকের সৎ 'আমালের সমান।"

(সহীহ্ আত্-তিরমিযী : কিতাবুল ফিতান, আবওয়াবুল তাফসীর; আবূ দাঊদ : ৪/১৫২, কিতাবুল মালাহিম, বাবুল আমরি ওয়াল নাহ-ই)

এমন কঠিন মুহূর্তে কোন একজন আদেশ ও নিষেধ নিয়ে এসে উপস্থিত হবে এ মনে করে যে, সে নিজে আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূল ﷺ-এর অনুগত, আসলে সে নিজেই সীমালঙ্ঘনকারী।

যেমন- অনেক বিদ্‘আতী ও প্রবৃত্তির পূজারীগণ নিজেদেরকে সৎকাজের আদেশদাতা ও অসৎকাজ হতে নিষেধকারী হিসেবে নিজেদের সাজিয়ে বসেছে। এ সকল লোক ঐ খারিজী, মুতাযিলা, রাফিজী ও অনুরূপ অন্যান্য গোষ্ঠীরই মত, যারা তাদের প্রতি আগত আদেশ ও নিষেধাবলীর ক্ষেত্রে ভুল করে বসেছে এবং এভাবেই তাদের সংশোধনী কাজের চেয়ে অনাসৃষ্টিই বেশী হয়েছে।

Contents

শাসকদের অত্যাচারে ধৈর্য ধারণ

এজন্যই নাবী ﷺ শাসকদের অত্যাচারে ধৈর্য ধারণের আদেশ দিয়েছেন এবং তারা যতদিন পর্যন্ত নামায যথারীতি প্রতিষ্ঠা করতে থাকবে, ততদিন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নিষেধ করেছেন। এ মর্মে নাবী ﷺ ইরশাদ করেছেন :

أَدُّوا إِلَيْهِمْ حُقُوقَهُمْ وَسَلُوا اللّٰهَ حُقُوقَكُمْ.

"তোমরা তাদের (শাসকদের) প্রাপ্য তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দাও এবং তোমাদের প্রাপ্য আল্লাহ্‌র কাছে চাও।* এ বিষয়ে অন্যত্র বিশদ আলোচনা করেছি।"

এ কারণেই আহ্‌লে সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আহ্-এর মূল নীতিসমূহের অন্তর্গত :

* দলবদ্ধ জীবন-যাপন করা।

* শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ না হওয়া।

* ফিত্‌নার সময়ে যুদ্ধ পরিহার করা।

অথচ প্রবৃত্তির আজ্ঞাবহ যারা। যেমন– মুতাযিলারা, তারা শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে তাদের ধর্মের মূলনীতি বলে গণ্য করে থাকে।

ওদিকে মুতাযিলারা তাদের ধর্মের মূলনীতি নির্ধারণ করে নিয়েছে নিম্নের পাঁচটি বিষয়কে :

---

* অর্থাৎ– অত্যাচারী শাসকদের সময় নিজেদের দা'ওয়াতই শাসকদের প্রাপ্য আর শাসকদের পক্ষ হতে দা'ওয়াত গ্রহণ তোমাদের প্রাপ্য, এটা আল্লাহ্‌র কাছে চেয়ে নিতে হবে। উল্লেখিত হাদীসখানা বুখারী ও মুসলিম; ইবনে হাম্বল : ১/৪৩২; আত্-তিরমিযী : ৪/৪৮২; কিতাবুল ফিতান : হা: নং- ২১৭) দ্রষ্টব্য।

✳ এমন (তাওহীদ) যা দ্বারা আল্লাহ্‌র গুণরাজিকে বাদ দেয়া হয়েছে।

✳ এমন (ন্যায়বিচার) যা দ্বারা তাক্‌দীরকে মিথ্যা বানানো হয়েছে।

✳ এমন (স্থান) যা দু'স্থানের মধ্যবর্তী।

✳ এমনতর (ধমকিকে) কার্যকর করা।

✳ এবং সৎকাজ আদেশ দান করাও অসৎকাজ হতে নিষেধ করা। এমনভাবে, যাতে শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা পর্যন্ত রয়েছে। এ সম্পর্কে অন্যত্র আলোকপাত করেছি।

মঙ্গল আনার চেয়ে অমঙ্গল দূর করাই শ্রেয়

এটার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি হচ্ছে, যা সাধারণ নিয়মনীতির আওতায় আসে। যখন ভাল ও মন্দ এবং পাপ ও পুণ্যের মাঝে দ্বন্দ্ব বাঁধতে বা একত্রে পাশাপাশি জমা হয়ে ভীড় সৃষ্টি করবে, তখন উত্তম বিষয়টিকেই প্রাধান্য দিতে হবে। কেননা নিশ্চয়ই আদেশ ও নিষেধ যদিও মঙ্গল বিধান করা ও অমঙ্গল দূর করাকে সংশ্লিষ্ট করে থাকে, তবুও পরস্পর দ্বন্দ্বের সময় বিপরীত বিষয়টির প্রতিই দৃষ্টি ফেলতে হবে। যদি দেখা যায় যে, একটি বিষয়ে (স্থান-কাল-পাত্র ভেদে) আদেশ দান করলে তথায় মঙ্গল বিধান করা সম্ভব হবে না, সেটা বরং অমঙ্গল ডেকে আনবে, এমতাবস্থায় ঐ বিষয়টি সম্পর্কে আদেশ দেয়ার কোনই হুকুম থাকবে না, বরং আদেশ দেয়াই হবে নিষিদ্ধ। কেননা তাতে মঙ্গলের চাইতে অমঙ্গলই বেশি।

আসলে কল্যাণ-অকল্যাণের পরিমাপ নির্ধারণ করা হবে শারী'আতের নিক্তিতে। মানুষ যখন কুরআন ও হাদীসের সরাসরি বর্ণনা মেনে চলতে সক্ষম হবে, তখন তারা সেটা হতে আর দূরে সরে যাবে না। পক্ষান্তরে যদি তা না পারে, তাহলে তারা সমরূপ বিষয় ও দৃষ্টান্তবলী জানার জন্য নিজস্ব রায় বা দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ইজতিহাদ করতে শুরু করবে। কুরআন ও হাদীসের মূল বক্তব্য তা ঐরূপ মানুষের খুব অল্পই প্রয়োজন বোধ করে থাকে, যারা ঐ বক্তব্যসমূহ ও সেটার অন্তর্নিহিত আহ্কামের প্রতি সূক্ষ্ম ইঙ্গিতাদি সম্বন্ধে পুরাপুরি ওয়াকিফহাল বা জ্ঞাত।

এটার উপর ভিত্তি করেই বলা যায় যে, যখন কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী পাপ ও পুণ্যকে একত্রিত করে ফেলবে এমনভাবে যে, ঐ পরস্পর বিরোধী দু'প্রকারের কাজের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করছে না। করছে তো পাপ পুণ্যের উভয়বিধ কাজ একত্রে করে যাচ্ছে, আবার ছাড়ছে তো উভয়বিধ কাজকে একত্রেই ছাড়ছে, তবে তাদেরকে সৎকাজের আদেশ দেয়া তো

বৈধ হবে না, আবার অসৎকাজ হতে নিষেধ করাও বৈধ হবে না, বরং দেখতে হবে যে, যদি সৎকাজ বেশি হয় তাহলে সৎকাজেরই আদেশ দেয়া হবে। আর যদি এমনই হয় যে, সেটার চেয়ে নিম্নমানের (অসৎ) কাজকে জরুরী মনে করে এবং অসৎ হতে নিষেধও করে না, তাহলে সেটার চেয়েও বড় (উত্তম) কাজ বাদ পড়ে যাবার কারণ হবে। তখন বরং ঐ কাজ হতে নিষেধ করা হবে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর আনুগত্য নিঃশেষ হয়ে যাওয়া ও সৎকাজ বিলীন হয়ে যাবার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

এহেন পরিস্থিতিতে যদি অসৎকাজই প্রবল হয়ে থাকে যা হতে নিষেধ করা হয়েছে এবং যদি সেটার চাইতে কম মানের (সৎ) কাজ বিলীন হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং ঐ সৎকাজের জন্য আদেশ করা উক্ত অতিরিক্ত অসৎকাজের কারণ হয়ে উঠে, তাহলে সেটা হবে অসৎকাজে আদেশ দেয়া ও আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর অবাধ্যতায় সচেষ্ট হওয়া।

অথচ যদি সৎকাজ ও অসৎকাজ সমান সমান হয় এবং উভয়টি ওৎপ্রোতভাবে জড়িত, অবস্থা এমন যে, তাদের কোনটিরই আদেশ ও দেয়া হয়নি আবার নিষেধও করা হয় না। সুতরাং এবার আদেশও করা চলে, আবার নিষেধও করা চলে। অন্যবার কিছুই চলে না। কারণ এখানে সৎকাজ অসৎকাজ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং ঐগুলো প্রাত্যহিক কিছু বিশেষ বিষয়ের মধ্যে বিদ্যমান পাওয়া যায়।

অথচ যদি প্রকারের* দিকের কথা তুলি, তবে সাধারণভাবে সৎকাজেরই আদেশ দেয়া হবে এবং অসৎকাজ হতে মূলতঃ সাধারণভাবে নিষেধই করা হবে**। অসৎকাজের কোন একজন কর্মীকে অথবা একটি

* এ হাদীসখানা মূল গ্রন্থের তৃতীয় পৃষ্ঠায় পরিমাপের দিক হতে সৎকাজের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে।

** কারণ অসৎ সর্বদাই অসৎ। সেটার অনেকও অসৎ আবার অল্প অসৎ এবং তুলনামূলকভাবে ক্ষতিকর। (সম্পাদক)

দলকে সেটার সৎকাজের জন্য আদেশ দেয়া হবে এবং সেটার অসৎকাজ হতে নিষেধও করতে হবে। সেটার ভাল কাজ-কর্মের প্রশংসাও যেমন করা হবে, তার খারাপ কাজ-কারবারের জন্য তেমনই যথাযথ নিন্দাও করা হবে, যেন কোন সৎকাজে আদেশ করার কারণে তার চাইতেও কোন ভাল কাজে খোয়া না যায়। অথবা ঐ অসৎকাজের চাইতেও জঘন্য ধরনের কোন অশ্লীল কাজ সংঘটিত হবার কারণ হয়ে না দাঁড়ায়। সাথে সাথে ঐ উত্তম কাজের আদেশ দানের ফলে, সেটা হতে অতি উত্তম কাজ বা বিষয় যেন বাদ পড়ে না যায়।

যখন কোন কাজে সন্দেহের উদ্রেক হয় তখন মু'মিনগণ ততক্ষণ পর্যন্ত সেটার ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করে, যতক্ষণ না তাদের সামনে আসল সত্য বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে ধরা দেয়। অতএব সে বিশ্বাসী লোক কোন আনুগত্যের কাজে প্রয়োজনীয় প্রকৃত জ্ঞান ও বিশুদ্ধ নিয়্যাত ব্যতিরেকে অগ্রসরই হয় না।

অথচ যদি ঐ কাজটি পালন না করে, তবে তো সে অবাধ্য বলে গণ্য হবে। কেননা যা করা ওয়াজিব সেটা ছেড়ে দেয়াই অপরাধ। আবার যা করতে নিষেধ করা হয়েছে সেটা করাই অপরাধ। এটা একটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা বহুল অধ্যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারও কোন শক্তি নেই, ক্ষমতাও নেই।

নাবী ﷺ যে 'আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালূল প্রমুখ (কপট ও দুষ্কর্মের পাণ্ডাদের নেতা)-কে তাদের দলবল ও সাঙ্গ-পাঙ্গ থাকার কারণে শাস্তি না দিয়ে বরং নীরব ভূমিকা অবলম্বন করেছিলেন তাও এ অধ্যায়েরই অন্তর্গত। কেননা 'আবদুল্লাহ বিন উবাইকে তার দুষ্কর্মের উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে ঐ অপকর্ম তখনই উচ্ছেদ করার অর্থই ছিল তার গোত্রীয় লোকদের গোস্বা ও প্রতিশোধ গ্রহণের উগ্রতা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাথীদেরকে হত্যা করছে শুনে লোকজনের দূরে সরে পড়ার সামনে, তদপেক্ষা বেশী বড়

সৎকাজের পথই বন্ধ করে দেয়া। আর বস্তুত এজন্যই উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ সিদ্দীকা তাহিরা (রাযি.)-এর প্রতি মিথ্যা অপবাদের ঘটনায় নাবী ﷺ যে ভাষণ দিয়েছিলেন এবং 'আবদুল্লাহ বিন উবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন এবং সা'দ বিন মা'আয (রাযি.) তাকে যা বলেছিলেন তা যথাযথই বলেছিলেন এতে সা'দ বিন 'উবাদাহ্ তাঁর সুন্দর ঈমান, গাঢ় বিশ্বাস ও আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও তার টানে (মনে মনে) গরম হয়ে গিয়েছিলেন।

এই সাথে তাদের প্রত্যেকের জন্যই স্ব-স্ব গোত্র, স্বজনপ্রীতি দেখিয়েছিল এমনকি তুমুল যুদ্ধ বাঁধার উপক্রম হয়েছিল।

আল্লাহ্‌র পছন্দ অনুযায়ী পছন্দ এবং আল্লাহ্‌র অপছন্দ অনুযায়ী তা অপছন্দ

এটার মৌলিক বিষয়টি হচ্ছে এই যে, মানুষ সকলেই প্রত্যেকটি সৎকাজকে ভালবাসবে এবং প্রতিটি অসৎকাজকেই ঘৃণা করবে। আবার সৎকাজ করার সদিচ্ছা ও অসৎকাজকে অপছন্দ করা ও ঘৃণা করা ঠিক আল্লাহ তা'আলার পছন্দ ও অপছন্দ অনুযায়ীই তা হতে হবে। এই সাথে তার কোন কিছুকে ভাল মনে করে তা পালনের ইচ্ছা বা ঘৃণাবশতঃ তাকে খারাপ মনে করে না করার শারী'আত সম্মত ইচ্ছা বা অনিচ্ছা হচ্ছে যে, সে প্রিয় ও ভাল বিষয়টি কাজে পরিণত করবে এবং যথাসাধ্য অপ্রিয় ও খারাপ বিষয়গুলোকে প্রতিহত করবে।

যেহেতু আল্লাহ তা'আলা কোন প্রাণীকেই তার সামর্থ্যের মাত্রাতিরিক্ত দায়িত্ব দেন না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং বলেছেন :

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

"অতএব তোমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহ্‌কে ভয় করো।"

(সূরা আত্-তাগাবুন ৬৪ : ১৬)

আর এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানে ত্রুটি না পাওয়া গেলে কখনও আল্লাহ্‌র প্রতি ভয় কম হবে না*। আর যে শারীরিক কাজ-কর্ম তা তো মানুষের শারীরিক শক্তি অনুযায়ীই হবে।

আর যখনই মানুষের কোন কিছু করার মানসিক ইচ্ছা প্রবল ও পরিপূর্ণ হবে, অথবা সেটার প্রতি ঘৃণা প্রবল বা পরিপূর্ণ হবে এবং ব্যক্তির

---

* অর্থাৎ– সাধ্যমত আল্লাহ্‌কে ভয় করার মানদণ্ড হচ্ছে ব্যক্তির ঈমান। যার ঈমান যে পরিমাণে বেশি বা কম, আল্লাহ্‌র প্রতি তার ভয়ের মাত্রাও সে পরিমাণে বেশি বা কম হবে। এ মানদণ্ডের ভিত্তিতে আল্লাহ্‌র প্রতি আপনার ভয়ের মান নির্ণয় করুন।

(সম্পাদক)

ইচ্ছানুযায়ী সামর্থ্যানুসারে হবে তখনই তাকে তার কাজের পরিপূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে। যেমন– অন্যত্র অন্য বিষয়ে সেটা বর্ণনা করেছি।

এ কথা সত্য যে, মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তিও আছেন যার প্রীতি-অপ্রীতি, কামনা-বাসনা বা ঘৃণা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর ভালবাসা, অথবা পছন্দ-অপছন্দ অনুযায়ী না হয়ে, বরং তা তার নফ্সের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী হয়ে থাকে। আসলে এটা এক ধরনের কু-প্রবৃত্তি। যদি মানুষ একেই শিরোধার্য করে নেয়, তাহলে তো তার নিজ প্রবৃত্তিরই দাসত্ব করল। এ লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

﴿وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ط﴾

"যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত পথনির্দেশনা ছাড়া স্বীয় প্রবৃত্তির দাসত্ব করে, তার চাইতে বেশি পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে?"– (সূরা আল-ক্বাসাস ২৮ : ৫০)। কেননা প্রবৃত্তির মূল কথাই হল নাফ্সের প্রতি ভালবাসা। আর নাফ্সের অনুসরণে নাফ্স যা ভালবাসে তাই ভালবাসা, আর নাফ্স যা কিছু খারাপ বলবে তাকেই খারাপ জানা।

আসলে প্রবৃত্তি সেটা ঐ প্রীতিভাব বা শত্রুতা পোষণ যা অন্তরে রয়েছে– এজন্য ব্যক্তিকে ভর্ৎসনা করা যায় না। কেননা সেটা এমনই যে সে সেটার উপর হয়তো বা কর্তৃত্বই রাখে না। তবে কোন ব্যক্তি যদি ঐ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তাহলেই তাকে ভর্ৎসনা করা হবে। যেমন এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা দাঊদ ('আ.)-কে বলছেন :

﴿يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط﴾

Contents

"হে দাঊদ! আমরা পৃথিবীতে তোমাকে প্রতিনিধি বানিয়েছি, সুতরাং লোকজনের মধ্যে আল্লাহ্‌র বিধান মুতাবিক বিচার ফায়সালা করবে, আর কখনও প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে না, অন্যথায় তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ হতে বিচ্যুত করে ফেলবে"– (সূরা আল-ক্বাসাস ২৮ : ২৬)। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন :

﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ ﴾

"যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত পথনির্দেশনা ব্যতীত স্বীয় প্রবৃত্তির দাসত্ব করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে?"

(সূরা আল-কাসাস ২৮ : ৫০)

প্রিয় নাবী ﷺ বলেছেন : তিনটি বিষয় আছে যা মানুষকে রক্ষা করতে পারে–

⁂ গোপনে-প্রকাশ্যে আল্লাহ্‌কে ভয় করা।

⁂ অভাব ও প্রাচুর্যের মধ্যপথে চলা।

⁂ রাগ বা খুশি উভয় অবস্থাতেই হক/সত্য কথা বলা।

অপরপক্ষে ধ্বংসকারীও তিনটি বিষয় রয়েছে :

⁂ এমন কৃপণতা যার আনুগত্য করা হচ্ছে।

⁂ এমন প্রবৃত্তি যার অনুসরণ করা হচ্ছে।

⁂ ব্যক্তির নিজেকে নিয়ে নিজে নিজে খুশি বা আনন্দিত হওয়া।

ব্যক্তি প্রিয় বস্তু বা অপ্রিয় বস্তুর উপস্থিতিকালে রুচি, ভালবাসা বা ঘৃণার অনুসরণ করে থাকে। অনুরূপ প্রেম, ইচ্ছা ইত্যাদিও। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তদীয় রাসূল ﷺ-এর আদেশ ব্যতিরেকেই সেটার অনুসরণ করবে, সে আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান ছাড়াই স্বীয় প্রবৃত্তির

দাসত্বকারীদের অন্তর্ভুক্ত। বরং তার এ অবস্থা তাকে নিয়ে এতদূর গড়াতে পারে যে, সে স্বীয় প্রবৃত্তিকেই সর্বকর্তা তথা ইলাহ্ বানিয়ে নিবে। অথচ ধর্মীয় বিষয়াদিতে প্রবৃত্তির অনুসরণ করা সাধারণ রুচিভিত্তিক বিষয়ে প্রবৃত্তির অনুসরণের চাইতে অনেক গুণে বেশী জঘন্য। কেননা আহ্‌লে কিতাবদের প্রাথমিক অবস্থার কাফিরদের কথা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

﴿فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ط وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ط إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِينَ ع﴾

"আর তারা (আহ্‌লে কিতাবগণ*) যদি আপনার আহ্বানে সাড়া না দেয়, তাহলে জেনে রাখুন যে, তারা স্ব-স্ব প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করছে, অথচ যে ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত বিধান বাদ দিয়ে, নিছক আপন প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে? আসলে যালিম সম্প্রদায়কে আল্লাহ সৎপথ প্রদর্শন করেন না।" (সূরা আল-কাসাস ২৮ : ৫০)

অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেছেন :

﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ ط هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِى مَا رَزَقْنٰكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ط كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ

* আল-কুরআন নাযিলের পূর্বে যাদের প্রতি আসমানী গ্রন্থ নাযিল হয়েছিল। যেমন : ইয়াহূদী ও খৃষ্টান।

يَّعْقِلُوْنَ ۞ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ج فَمَنْ يَّهْدِيْ مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ط وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴾

"তোমাদের নিজেদের মধ্য হতেই তোমাদের জন্য উদাহরণ পেশ করেছেন। তোমাদেরকে আমরা যে রিয্ক দিয়েছি এবং তোমাদের দক্ষিণ হস্তসমূহ যার অধিকারী হয়েছে, তাতে কি তোমাদের কোনও অংশীদার আছে যে তোমরা তাতে সকলেই সমান অধিকারী? তাদেরকে তোমাদের নিজেদেরকে ভয় করার মতোই ভয় করে থাক? আমরা অনুরূপেই জ্ঞানবানদের জন্য নিদর্শনাবলী বিশ্লেষণ করে থাকি। অথচ যারা অত্যাচার করেছে তারা অজ্ঞাতসারে নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে। অতএব আল্লাহ (স্বয়ং) যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তাকে আর হিদায়াত (পথ প্রদর্শন) করবে কে? আসলে তাদের কোনও সাহায্যকারীই নেই।"

(সূরা আর-রূম ৩০ : ২৮-২৯)

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তা'আলা অন্যত্র বলেছেন :

﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ ط وَاِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَآئِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ط اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ ﴾

"আর তোমাদের জন্য যা কিছু হারাম করেছেন তার বিশদভাবে বিবরণ দিয়েছেন। তবে যে সকল জিনিসের প্রতি তোমরা একেবারেই অনন্যোপায় হয়ে অপরিহার্য প্রয়োজন অনুভব করবে, তা ভিন্ন ব্যাপার। নিশ্চয়ই অনেকেই অজ্ঞানতাবশতঃ তাদের প্রবৃত্তির তাড়নায় (অন্যদেরকে) পথভ্রষ্ট করে থাকে। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক ঐ সকল সীমালঙ্ঘনকারীদের সম্পর্কে বেশি জ্ঞাত।" (সূরা আল-আন'আম ৬ : ১১৯)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা অন্যত্র আরও বলেছেন :

﴿قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ع﴾

"আপনি বলুন, হে কিতাবী সম্প্রদায়! সত্যকে বাদ দিয়ে তোমাদের দীনের মধ্যে কোন অতিরঞ্জিত কিছু করো না। আর যে সকল জাতি ইতোপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে, অন্য বহু জনকে পথচ্যুত করেছে এবং নিজেরাও সোজাপথ হারিয়ে ফেলেছে, তাদের প্রবৃত্তির অনুকরণ অনুসরণ করো না।"
(সূরা আল-মায়িদাহ্ ৫ : ৭৭)

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তা'আলা অন্য এক জায়গায় বলেছেন :

﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ط قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى ط وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ لا مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾

"আপনার প্রতি (হে মুহাম্মাদ) ইয়াহূদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায় কখনও সন্তুষ্ট হবে না যদি না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন। আপনি বলে দিন, আল্লাহ প্রদত্ত পথ প্রদর্শনই হচ্ছে যথার্থ পথ প্রদর্শন। আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে আপনার প্রতি প্রকৃত জ্ঞান* আসার পর যদি আপনি তাদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করেন, তাহলে আপনার জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে আর কোনও সাহায্যকারী বা পৃষ্ঠপোষক থাকবে না।" (সূরা আল-বাকারাহ্ ২ : ১২০)

---

* এখানে জ্ঞান দ্বারা ওয়াহীর জ্ঞানের অর্থ নেয়া হয়েছে। (সম্পাদক)

অন্যান্য আয়াতসমূহেও বলেছেন :

﴿وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ﴾

"আপনার প্রতি জ্ঞান আসার পরও যদি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণই করেন, তাহলে আপনি অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বেন।"

(সূরা আল-বাকারাহ্ ২ : ১৪৫)

অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা আরও বলেছেন :

﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾

"এবং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সেটা দ্বারাই তাদের পরস্পরের মধ্যে বিচার ফায়সালা করুন। কখনও তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকুন; কেননা আপনার প্রতি যা আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেছেন, তার কিয়দংশের ব্যাপারে তারা আপনাকে মিথ্যার জালে জড়িয়ে ফেলবে।" (সূরা আল-মায়িদাহ্ ৫ : ৪৯)

অতএব যারাই আল-কুরআন ও সুন্নাহ্র নীতির বাইরে চলে গেছে– যাদেরকে 'উলামাহ্ ও দরবেশ সম্প্রদায়ভুক্ত বলে ধরা হয়, তাদেরকেই 'প্রবৃত্তির অনুসরণকারী' বলে আখ্যা দেয়া হবে। সেটা এজন্যই যে, কেউ যদি জ্ঞানের অনুসরণ (জ্ঞানানুযায়ী কাজ) না করে, তবেই প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করল।*

---

* জ্ঞানানুযায়ী কাজ না করার অর্থই প্রবৃত্তির অনুসরণ করা। কারণ জ্ঞান মানুষকে সত্য পথে পরিচালনা করে, প্রবৃত্তি তার বিপরীতমুখী। (সম্পাদক)

Contents

দীন সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ সে হিদায়াত (পথ নির্দেশনা) যা দিয়ে তিনি তাঁর রাসূল ﷺ-কে পাঠিয়েছিলেন– তাছাড়া কোনরূপেই হতে পারে না। এজন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা এক স্থানে বলেছেন :

﴿وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ﴾

"আর নিশ্চয়ই তারা অজ্ঞানতার কারণে নিজেদের প্রবৃত্তির দ্বারা বহুজনকে পথভ্রষ্ট করছে।" (সূরা আল-আন'আম ৬ : ১১৯)

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তা'আলা অন্য আর এক বিষয়ে বলেছেন :

﴿فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথনির্দেশনা বাদ দিয়ে তার স্বীয় প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করেছে, তার চাইতে বেশি পথভ্রষ্ট আর কে?"

(সূরা কাসাস ২৮ : ৫০)

অতএব ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য হল, সে যেন তার নিজের পছন্দ ও অপছন্দের প্রতিই তীক্ষ্ম দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবং পছন্দ-অপছন্দের সঠিক পরিমাণ তলিয়ে দেখে– সেটা কি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর আদেশ মতোই আছে? সেটা কি আল্লাহ্র পথ নির্দেশনা মুতাবিক– যা তিনি তাঁর রাসূল ﷺ-এর প্রতি অবতীর্ণ করেছিলেন, যাতে তিনি ﷺ ঐ পছন্দ ও অপছন্দ মেনে চলতে আদিষ্ট হতে পারেন–হচ্ছে। যাতে সে (ব্যক্তি) ঐ বিষয়ে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের আগে বেড়ে ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারী হয়ে না পড়ে। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেছেন :

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ﴾

"ওহে, যারা ঈমান এনেছো। তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে (কোন ব্যাপারে) বেশি এগিয়ে যেও না (বা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করো না।)" (সূরা আল-হুজুরাত ৪৯ : ১)

যে ব্যক্তিই আল্লাহ ও আল্লাহ্‌র রাসূলের আদেশের আগেই কোন কিছুকে ভালবাসলো বা অপছন্দ করল, তারই মধ্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে বেড়ে ধৃষ্টতা দেখাবার মত দোষের একটি লক্ষণ রয়েছে। কিছু ভালবাসা বা না বাসাটাই প্রবৃত্তি। কিন্তু এটার মধ্যে হারাম হল– আল্লাহ্‌র নির্দেশনা ছাড়া কেবল ব্যক্তির পছন্দ বা অপছন্দেরই অনুসরণ করা। এজন্যই স্বয়ং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা তাঁর প্রিয়নাবী দাউদ ('আ.)-কে বলেছিলেন :

﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ع﴾

"প্রবৃত্তির অনুসরণই করো না নচেৎ তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ হতে বিচ্যুত করে ফেলবে। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্‌র পথ হতে বিপথগামী হবে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।" (সূরা সাদ ৩৮ : ২৬)

এখানে এ মর্মে সংবাদ দিয়েছেন যে, যে-ই তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে, সেটা তাকেই আল্লাহ্‌র পথ হতে বিপথে নিয়ে গেছে। আল্লাহ্‌র পথ হল– তাঁরই দেয়া পথ নির্দেশনা, যা দিয়ে তিনি তাঁর রাসূল ﷺ-কে প্রেরণ করেছেন। আর সেটাই আল্লাহ্‌কে পাবার একমাত্র সরল পথ।

সেটার বাস্তবায়ন হল, নিশ্চয়ই সৎকাজে আদেশ দান ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করা, সবচাইতে অবশ্য করণীয়, সবচাইতে উত্তম ও সবচাইতে সুন্দর। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেছেন :

﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ط﴾

"তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য যে, তোমাদের মধ্যে উত্তম কাজ সম্পাদনকারী কে?" (সূরা আল-মুল্‌ক ৬৭ : ২)

সেটা ঠিক আল্‌-ফুযাইল বিন ইয়ায (রাযি.)-এর উক্তিরই অনুরূপ : "কাজ যতই খালিস আল্লাহ্‌র জন্য হবে ততই সঠিক হবে। কেননা যখন কাজ (সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ হতে নিষেধ) একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য হবে অথচ সঠিক হবে না, তখন সেটা গৃহীত হবে না। আবার যখন কাজটি শুদ্ধই হয়েছে অথচ একমাত্র আল্লাহ্‌রই জন্য হয়নি, তখন সেটাও গৃহীত হবে না যতক্ষণ না খালিস হবে, সঠিক হবে এবং শুধু একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য হবে। আর কাজ তখনই সঠিক হবে, যখন রাসূল ﷺ-এর সুন্নাত মতো হবে।

আসলে সৎকাজ– সেটা দ্বারা একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানই কাম্য হওয়া আবশ্যক। কেননা যে সৎকাজ দ্বারা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্টি বিধানে ইচ্ছা রয়েছে, সেটা ব্যতীত তিনি কিছুই গ্রহণ করেন না। যেমন– একটি সহীহ হাদীস এসেছে, আবূ হুরাইরাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেছেন :

يقول الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو كله للذي أشرك.

"আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : আমি অংশীদায়িত্ব হতে সকল অংশীদারদের চাইতে মুখাপেক্ষাহীন যে কোন 'আমাল (কাজ) করুক তাতে

যদি সে অন্যকে আমার সাথে অংশীদার স্থাপন করে থাকে, তাহলে আমি সেটার সাথে কোন সম্পর্কই রাখি না, ঐ কাজ পুরোটাই তার, যাকে সে অংশীদার বানিয়েছে।" (হাদীস-ই-কুদ্সী)

এটাই হল একত্ববাদ (তাওহীদ), যা ইসলামের মূল। তাই হচ্ছে সে দীন যা সহ সমস্ত রাসূলগণকে পাঠানো হয়েছিল। এ তাওহীদের জন্যই সমুদয় সৃষ্টি। এ তাওহীদই আল্লাহ্র সৃষ্ট দাসদের নিকট হতে সত্যিকার অর্থে প্রাপ্য যেন তারা একমাত্র তাঁরই 'ইবাদাত (দাসত্ব) করে, অন্যদিকে আর কোন কিছুকেই যেন তাঁর সাথে শরীক তথা অংশীদার না গণ্য করে।

এতদসত্ত্বেও এটা অত্যন্ত অপরিহার্য যে, সকল প্রকারের কর্মকাণ্ডই যেন সৎ হয়। সেটা সম্পর্কেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ আদেশ করেছেন। মূলতঃ তাই আনুগত্য।

সুতরাং আনুগত্য বলতেই যেমন সৎকাজ বুঝায়, আবার সৎকাজ বলতেও তেমনি আনুগত্য বুঝায়। যা শারী'আত সম্মত, নাবীর সুন্নাত মুতাবিক, নাবী ﷺ-কে সেটারই আদেশ দেয়া হয়েছিল। হয়তো ওয়াজিব হিসেবে আদেশ দেয়া হয়েছিল, না হয়তো মুস্তাহাব হিসেবে। এটাই সৎকাজ, এটাই সুন্দর, এটাই সততা, এটাই উত্তম। অথচ সেটার উল্টাগুলোই হচ্ছে : পাপকর্ম, অসার ও মূল্যহীন কুকর্ম, অনাচার-অত্যাচার।

যখন সকল কাজেই দু'টি বিষয় : নিয়্যাত ও চেষ্টা অপরিহার্য। যেমন– নাবী ﷺ বলেছেন :

أصدق الأسماء حارث، وهمّام.

"নামসমূহের মধ্যে বেশি সত্য নাম হচ্ছে– হারিস তথা কর্ষক ও হাম্মাম : অর্থাৎ– অতিশয় সংকল্পকারী ও কর্মপরায়ণ"– (আবূ দাউদ : ৪/২৮৮; আত্-তিরমিযী : ৬/২১৮; আবূ ওয়াহ্ব আল-জুশামীর বর্ণনায় আবূ দাউদের

রিওয়ায়াতে وكانت صحية এসেছে)। কিন্তু প্রশংসিত যে নিয়্যাতটি আল্লাহ্ গ্রহণ করবেন এবং তদানুযায়ী সাওয়াব দিবেন, সেটা হচ্ছে : ঐ নিয়্যাত যা দিয়ে শুধুমাত্র আল্লাহ্কে উদ্দেশ্য করেই কাজ করা হবে।

প্রশংসনীয় কাজ হলে– সৎকাজ যার আদেশ করা হয়েছে। এজন্যই 'উমার (রাযি.) তাঁর দু'আতে বলতেন :

اللهم اجعَلْ عملي كله صالحاً واجعله لوجهك خالصًا ولاتجعل لأحدٍ فيه شيئًا.

"হে আল্লাহ! আমার প্রতিটি কার্যক্রমকে সৎভাবে পরিণত করো এবং সেটাকে খালিস একমাত্র তোমার জন্যই করে নিও, সেটাতে এক বিন্দুও কারো জন্য রেখো না।"

এটাই যখন প্রত্যেকটি সৎকাজের সংজ্ঞা, তখন সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করাও অনুরূপই হওয়া অপরিহার্য। এটা সৎকাজে আদেশকারী ও অসৎকাজ হতে নিষেধকারীর বেলায়ও প্রযোজ্য।

সৎকাজে আদেশ দেয়া ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করার ক্ষেত্রে শর্তাবলী

১। তার কাজ সুষ্ঠু হবে না যদি না সেটা পরিমিত শিক্ষা ও তীক্ষ্মজ্ঞান ভিত্তিক হয়।

যেমন– 'উমার বিন 'আবদুল 'আযীয (রহ.) বলেছেন :

من عبد اللّٰه بغير علم كان مايفسد أكثر ممّا يصلح.

"যে ব্যক্তি বিনা বিদ্যায় আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত করে, সে যতটুকু ভাল করে, তার চাইতে খারাপই বেশি করে।"

যেমন– মা'আয বিন জাবাল (রাযি.)-এর হাদীসে আছে :

العلم أمام العمل والعمل تابعه.

"কাজ করার আগে প্রয়োজন জ্ঞান; কাজের স্থান হল বিদ্যার্জনের পর।" এটা তো একেবারেই স্পষ্ট। কেননা ইচ্ছা করা ও কর্ম সম্পাদন করা যদি জ্ঞানের আলোকেই না হয়, তাহলে সেটাই মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতা, সর্বোপরি প্রবৃত্তির অনুসরণ। যেমন– ইতোপূর্বে সেটার আলোচনা হয়েছে এবং এটাই হল মূর্খতার (ইসলাম পূর্ব) যুগের অধিবাসী ও ইসলামী যুগের অধিবাসীদের মধ্যে পার্থক্য। সুতরাং সৎ ও অসৎকাজ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা ও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করার মত উপযুক্ত শিক্ষা থাকা অবশ্যই প্রয়োজন এবং যাকে কোন বিষয়ে আদেশ করা হবে বা কোন কাজ হতে নিষেধ করা হবে, তার অবস্থা সম্পর্কেও জ্ঞান থাকা অপরিহার্য।

২। উত্তম হল : আদেশ বা নিষেধ করা। যেমন, সিরাতাল মুস্তাকীম তথা সরলপথ অনুযায়ী হয়। আসলে সিরাতাল মুস্তাকীম হল– উদ্দেশ্য অর্জনের দিকে অতি দ্রুত পৌঁছাবার মত সংক্ষিপ্ত তথা নিকটতম পথ।

৩। সুনম্র ব্যবহার ঐ কাজের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। যেমন : নাবী ﷺ বলেছেন–

ما كان الرفق فى شيء إلا زانه ولا كان العنف فى شيء إلا شانه.

"যে বিষয়েই নম্রতা পাওয়া গেছে তা সে বিষয়কেই সুশোভিত করেছে, আবার যে বিষয়েই খানিকটা কঠোরতা পাওয়া গেছে তা সে বিষয়কেই অশোভিত করেছে– দৃষ্টিকটু করে ফেলেছে"– (মুসলিম : হা: নং– ২৫৯৪; ইবনে মাজাহ্)। নাবী ﷺ বলেছেন :

إن اللّه رفيق يحب الرفق فى الأمر كله ويعطى مالا يعطى على العنف.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ দয়াশীল, প্রত্যেকটি বিষয়েই নম্র ব্যবহার তিনি পছন্দ করেন, নম্রতাপূর্ণ ব্যবহারের ফলে তিনি যা দান করেন কঠোরতার কারণে তা দেন না।"

(বুখারী : ১২/২৮০, ফাতহুল বারী আলা শারহিল বুখারী, কিতাবুল ইসতিতাবাহ; মুসলিম : কিতাবুসসিয়ার, ৮/২২; আবূ দাঊদ, কিতাবুল আওয়াল, ৫/১৫৫; আত্-তিরমিযী : ৫/৬০, হা: নং– ১৭০১; ইবনে মাজাহ্ : ২/১২১৬, কিতাবুল আদব-বাবুন ফির্‌রিফক্; আল-দারিমী : ২/৩২৩; ইবনে হাম্বাল : ১/১১২)

৪। আদেশ দানকারী বা নিষেধকারীকে অবশ্যই কষ্টে সহিষ্ণু ও ধৈর্যশীল হতে হবে। কেননা, এ কথা সত্য যে, তার উপর বিপদ আসবেই। এমন সময় যদি সে ধৈর্য ধারণই না করে, সহ্যই না করে, তাহলে সে যা ভাল করতে পারত তার চাইতে নষ্টই করে বসবে বেশি। যেমন– লুকমান হাকীম তদীয় তনয়কে উপদেশ দানকালে বলেছিলেন :

﴿ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾

"এবং (হে বৎস)! সৎকাজ আদেশ দান কর এবং অসৎকাজ হতে নিষেধ কর, (এ কাজ করতে যেয়ে) তোমার উপর যে বিপদ আপতিত হবে তাতে ধৈর্য অবলম্বন কর, নিঃসন্দেহে সেটা একটি মহৎ কাজ।"

(সূরা লুকমান ৩১ : ১৭)

এজন্যই আল্লাহ তা'আলার রাসূলগণ– অথচ তাঁরা সৎকাজে আদেশ দানকারী ও অসৎকাজ হতে নিষেধকারীদের নেতাকে ধৈর্য অবলম্বনের আদেশ দিয়েছেন। যেমন– তিনি সর্বশেষ রাসূল ﷺ-কে বলেছেন, আসলে সেটা (ধৈর্য) রিসালাতের দায়িত্ব তাব্‌লীগের সাথেই জড়িত। কেননা সর্বপ্রথম যখন তাঁকে (ﷺ) রাসূল হিসেবে গণ্য করা হল, তখনই সূরা 'ইক্‌রা' নাযিল হবার পর (যার মাধ্যমে তাঁকে নাবী বলে সংবাদ দেয়া হয়েছে) আল্লাহ তাঁকে আদরভরে সম্বোধন করে বললেন :

﴿يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۙ ۝ قُمْ فَأَنْذِرْ ۙ ۝ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۙ ۝ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۙ ۝ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۙ ۝ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۙ ۝ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ط﴾

"হে চাদর আচ্ছাদনকারী! উঠুন এবং ভয় প্রদর্শন করুন এবং আপনার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন, আপনার বেশভূষা পবিত্র করুন, অপবিত্রতা (মূর্তি) পরিত্যাগ করুন আর কাউকেও এ উদ্দেশে দান করবেন না যে, অতিরিক্ত বিনিময় প্রত্যাশায় এবং আপনার প্রতিপালকের সন্তুষ্টির উদ্দেশেই ধৈর্য অবলম্বন করুন।" (সূরা আল-মুদ্দাস্‌সির ৭৪ : ১-৭)

নাবী ﷺ-কে রাসূল হিসেবে সৃষ্টি জগতে প্রেরণের এ আয়াতগুলো ভীতি প্রদর্শনমূলক বিষয় দ্বারাই শুরু তথা সূচনা করেছেন এবং ধৈর্য ধারণের আদেশ দানের মাধ্যমে শেষ করেছেন। মূলতঃ শাস্তির ভয় প্রদর্শনই হল সৎকাজে আদেশ দান ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করা।

অতএব জানা হয়ে গেল যে এটার পরই ধৈর্য ধারণ করা ওয়াজিব, তথা অপরিহার্য। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেছেন :

﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۖ﴾

"এবং আপনার প্রতিপালকের এ ব্যবস্থার উপর (ফায়সালার অপেক্ষায়) ধৈর্য অবলম্বন করুন, নিঃসন্দেহে আপনি আমাদেরই দৃষ্টিতে আছেন।" (সূরা আত্-তূর ৫২ : ৪৮)

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা অন্যত্র আরও বলেছেন :

﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾

"তাদের কথায় (বিচলিত না হয়ে বরং) ধৈর্য অবলম্বন করুন এবং তাদেরকে নির্দ্বিধায় পরিত্যাগ করুন।" (সূরা আল-মুয্যাম্মিল ৭৩ : ১০)

অন্য এক আয়াতে এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেছেন :

﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ط﴾

"দৃঢ় সংকল্পচিত্ত রাসূলগণের মতই আপনিও ধৈর্য ধারণ করুন।"
(সূরা আল-আহ্কাফ ৪৬ : ৩৫)

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা আরও বলেছেন :

﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ﴾

"আল্লাহ্র আদেশের অপেক্ষায় ধৈর্য ধারণ করুন এবং (খবরদার) মাছের কাহিনীর সে লোক (ইউনুস) ('আ.)-এর মতো অধৈর্য হয়ো না।"
(সূরা আল-কালাম ৬৮ : ৪৮)

ধৈর্য সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র আরও বলেছেন :

﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾

"ধৈর্যই অবলম্বন করতে থাকুন, আসলে আপনার ধৈর্য ধারণ তো একমাত্র আল্লাহ্‌রই জন্য ছাড়া নয়।" (সূরা আন্-নাহ্‌ল ১৬ : ১২৬)

আবার আর এক স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

﴿وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾

"আপনি ধৈর্য ধারণ করুন, কেননা আল্লাহ্ তা'আলা নিষ্ঠাবানদের কর্মফল বিলীন অর্থাৎ– নষ্ট করেন না।" (সূরা হূদ ১১ : ১১৫)

সুতরাং শিক্ষা, নম্রতা ও ধৈর্য– এ তিনটি বিষয় ছাড়া কোন ক্রমেই চলবে না। আদেশ করা বা নিষেধ করার পূর্বেই জ্ঞানের দরকার এবং সে সঙ্গে নম্রতা, আর এটার পরেই প্রয়োজন ধৈর্যের। যদিও এ ত্রিবিধ বিষয়গুলোই সর্বাবস্থাতেই একই সঙ্গে পাওয়া যেতে হবে।

যেমন– সাল্‌ফে সালিহীনদের কোন একজনের উক্তি বর্ণনাকারী পরম্পরায় মারূফভাবে আল-কাজী আবূ ইয়ালা "আল-মু'তামাদ" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন :

لايأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر الا من كان فقيها فيما يأمر به فقيها فيما ينهى عنه رفيقا فيما يأمربه رفيقا فيما ينهى عنه حليما فيما يأمر به حليما فيما ينهى عنه.

"যিনি সৎকাজে আদেশ করবেন ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করবেন, তিনি যদি ঐ বিষয়ে সুবিজ্ঞ 'আলিম তথা ফকীহ্ না হন, তাহলে তিনি তা করতে পারেন না। অনুরূপ তিনি যে বিষয়ে আদেশ দিবেন, সে বিষয় নম্র হবেন এবং যে বিষয় হতে নিষেধ করবেন সে বিষয়েও নম্র হবেন এবং যে বিষয়ে আদেশ দিবেন সে বিষয়ে তাকে সহিষ্ণু হতে হবে, আবার যে বিষয় হতে নিষেধ করবেন সে বিষয়েও তাকে সহিষ্ণু হতে হবে।" তা না হলে তিনি সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করতে পারবেন না। সে

যেন এটাও জেনে রাখে যে, সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করার কতগুলো পদ্ধতি তথা নীতি আছে, যার জটিলতা অনেকের উপরই এনে ফেলে। তখন সে ধারণা করে যে, ঐ সকল জটিলতার কারণে সেটা হতে বাদ পড়ে যাবে।

অতএব সে এ কাজই ছেড়ে দেয়। সেটা এমন বিষয়সমূহের অন্তর্গত যে, এ পদ্ধতিগুলো না পাওয়া গেলে তার মূল বিষয়টিকে (সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ হতে নিষেধ) ক্ষতিগ্রস্ত করবে। কেননা অবশ্য করণীয় কাজটি না করাও পাপ। আবার আল্লাহ তা'আলা যা করতে নিষেধ করেছেন সেটা করাও পাপ।

সুতরাং এক পাপ হতে অন্য পাপে জড়িয়ে পড়ার উদাহরণ হল, একটি বাতিল দীন বা জীবন-ব্যবস্থা হতে সরে অন্য আর একটি বাতিল দীন বা জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এমন হওয়াও সম্ভব যে, প্রথমটির চাইতে দ্বিতীয়টি বেশী মাত্রায় খারাপ, আবার এটার মাত্রা একটু কমও হতে পারে। হয়তো বা দু'টি জীবন ব্যবস্থাই খারাপ হিসেবে সমান। সৎকাজে আদেশদানকারী ও অসৎকাজ হতে নিষেধকারী যাদের মধ্যে ত্রুটি পাওয়া যাবে, অর্থাৎ– ভালরূপে দায়িত্ব পালন করতে পারেনি অথবা তাতে সীমালঙ্ঘন করেছে, তাদের কাউকে পাবে যে, এই জনের দোষ সাংঘাতিক বড়, ঐ জনের পাপ সাংঘাতিক ধরনের বড়, আবার হয়তো বা উভয়েই পাপে বরাবর বা একই শ্রেণীভুক্ত।

জাতির পাপকাজেই বিপদের তথা দুর্ভোগের কারণ এবং পুণ্যের কারণে প্রাচুর্য আসে

এটা জানা কথা– আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিদর্শনসমূহ হতে আমাদের ভিতরকার বা তার সৌরমণ্ডলীয় যা আমাদেরকে দেখিয়েছেন আর তাঁর মহাগ্রন্থে যেসব বিষয়ে প্রমাণ উপস্থাপন করেছে, নিশ্চয়ই পাপসমূহই দুঃখ-দুর্দশার (একমাত্র) কারণ।

সুতরাং কঠিন বিপদাপদ ও জঘন্য জঘন্য শাস্তি হয়ে থাকে শুধু জঘন্য ধরনের কুকর্মের কারণেই। অপরপক্ষে পুণ্য তথা সৎকাজ বয়ে আনে পুরস্কার। সুতরাং ব্যক্তির উত্তম কর্ম সম্পাদনই আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে উত্তম পুরস্কারের কারণ।

এ সুবাদে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেছেন :

﴿ وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ط ﴾

"আসলে তোমাদেরকে যেসব বিপদাপদে পেয়ে গেছে, সেটা তোমাদের হস্তসমূহেরই অর্জিত ফল, অথচ আল্লাহ তা'আলা অনেক বিষয়ই ক্ষমা করে থাকেন।" (সূরা আশ্-শূরা ৪২ : ৩০)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা অন্যত্র বলেছেন :

﴿ مَآ اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ز وَمَآ اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ ط ﴾

"তোমাদের যা কিছু উত্তম ফল পৌঁছে তা আল্লাহ্‌রই পক্ষ হতে, আর যা কিছু শাস্তি পৌঁছে তা তোমার নিজেরই কর্মফল।"(সূরা আন্-নিসা ৪ : ৭৯)

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আরও বলেছেন–

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۖ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾

"নিশ্চয়ই যারা দু'টি দলের পরস্পর মুখোমুখি (সম্মুখ সমরে মিলিত) হবার দিনে তোমাদেরকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল, সেটা তাদের কিছু কর্মকাণ্ডের ফলে শয়তানই তাদেরকে ফুসলিয়ে সরিয়ে নিতে চেয়েছিল বৈ কিছু নয়। অথচ আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করেছিলেন।"

(সূরা আ-লি-'ইমরান ৩ : ১৫৫)

অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেছেন :

﴿أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا ۖ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ۗ﴾

"আর যখন তোমাদের উপর মুসীবাত এসে পড়ল অথচ তোমরা তার দিগুণ আঘাত হেনেছিলে, তোমরা তখন হা-হুতাশ করে প্রশ্ন তুলেছিলে– এ বিপদ কোথা হতে আসল? হে রাসূল ﷺ বলুন! এ বিপদ তোমাদেরই মধ্য হতে এসেছে (তোমাদের নিজস্ব কর্মফল এ বিপদের কারণ)।"

(সূরা আ-লি 'ইমরান ৩ : ১৬৫)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা আরও বলেছেন :

﴿أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ﴾

"অথবা তিনি তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলবেন অথচ অনেককে ক্ষমা করে দিবেন।" (সূরা আশ্-শূরা ৪২ : ৩৪)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

﴿وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ﴾

"আর যদি তাদেরকে কোন বিপদে পেয়ে বসে তবে সেটা তাদেরই নিজ হাতের কর্ম ফল। আসলে মানুষ অত্যন্ত কৃতঘ্ন।"

(সূরা আশ্-শূরা ৪২ : ৪৮)

তিনি আরও বলেছেন :

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾

"যখন তারা ক্ষমা চাইতে থাকে তখন ঐ অবস্থায় আল্লাহ তাদেরকে শাস্তিই দিবেন না।" (সূরা আল-আনফাল ৮ : ৩৩)

নূহ্ ('আ.)-এর জাতির এরূপ আরও পাপী জাতিসমূহ যেমন– 'আদ, সামূদ, লূত নাবীর জাতি, মাদায়িনবাসী এবং ফির'আওনের জাতিকে এ পৃথিবীতেই কিসের জন্য আল্লাহ তা'আলা শাস্তি দিয়েছিলেন, সে সংবাদ তিনি দিয়েছেন। আবার পারলৌকিক জগতেও কিভাবে শাস্তি দিবেন তাও বলে দিয়েছেন।

এজন্যই ফির'আওন সম্প্রদায়ভুক্ত একজন মু'মিন ব্যক্তি বলেছিলেন :

﴿يٰقَوْمِ إِنِّيْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ۙ ۞ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۚ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ۞ وَيٰقَوْمِ إِنِّيْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ۞ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ ۚ مَا لَكُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾

"হে আমার জাতি! আমি নিশ্চয়ই তোমাদের উপর বিপদের দিনে আসা বিপদের মত (আর একটি) আসন্ন বিপদের ভয় করছি। যেমন হয়েছিল নূহ্ ('আ.)-এর জাতির প্রতি, ওই দিকে 'আদ, সামূদ এবং যারা তাদের পরবর্তীকালে। আসলে আল্লাহ তো কখনই তার বান্দাদের প্রতি অত্যাচার চান না। হে আমার জাতি! আমি তোমাদের জন্য আশংকা করি উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদের সেদিনের (শাস্তির) ভয় করছি। যেদিন তোমরা পিঠটান দিয়ে পলায়নপর হয়ে চলে যাবে। আল্লাহ্র শাস্তি হতে রক্ষাকারী তোমাদের জন্য আর কেউই থাকবে না। আসলে আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য আর কোনও পথপ্রদর্শনকারী থাকে না।"

(সূরা গাফির ৪০ : ৩০-৩৩)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেছেন :

﴿ كَذٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ﴾

"আযাবও ঠিক ঐ রকমই, কিন্তু আখিরাতের 'আযাব আরও ভয়ঙ্কর।"

(সূরা আল-কালাম ৬৮ : ৩৩)

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আরও বলেছেন :

﴿ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ ﴾

"অতিসত্বরই আমি তাদেরকে দু'বার শাস্তি দিব, অতঃপর তারা আরও বড় কঠিন শাস্তিতে নিপতিত হবে।" (সূরা আত্-তাওবাহ্ ৯ : ১০১)

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

﴿ وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴾

"আমরা অবশ্য আবশ্যই তাদেরকে বড় শাস্তির চাইতে অপেক্ষাকৃত ছোট শাস্তি ভোগ (স্বাদ গ্রহণ) করাব, যেন তারা অবশ্যই সৎপথে ফিরে আসে।" (সূরা আস্-সাজদাহ্ ৩২ : ২১)

আর একটি আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেছেন :

﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ۙ ۝ يَغْشَى النَّاسَ ۖ هَٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ۝ أَنَّىٰ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ۙ ۝ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ۘ ۝ إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا ۚ إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ۘ ۝ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ ۚ إِنَّا مُنتَقِمُونَ﴾

"অতএব, অপেক্ষা করুন ঐ দিনের যেদিন আসমান প্রকাশ্য ধোঁয়া নিয়ে আসবে। যা লোকদেরকে ঢেকে ফেলবে। এটা হবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তারা তখন প্রার্থনা করবে ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে এ শাস্তি দূর করুন, আমরা অবশ্যই ঈমান আনব। তারা কেমন করে উপদেশ গ্রহণ করবে? তাদের কাছে এসেছেন স্পষ্ট বর্ণনাকারী এক রাসূল। অতঃপর তারা তাকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল এবং বলল ঃ সে তো এক শিক্ষাপ্রাপ্ত, পাগল। আমি কিছু সময়ের জন্য এ 'আযাব দূর করে দিব, তোমরা তো পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে। যেদিন আমরা ভয়ঙ্করভাবে পাকড়াও করব। নিঃসন্দেহে আমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করব।"

(সূরা আদ্-দুখান ৪৪ : ১০-১৬)

এজন্যই আল্লাহ তা'আলা সাধারণভাবে সতর্কবাণী সম্বলিত সূরাসমূহে পৃথিবীতে পাপীদেরকে কিরূপে শাস্তি দিলেন এবং পরকালে তাদের জন্য

কিরূপ শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন তা উল্লেখ করে থাকেন। আবার কোনও বিশেষ সূরায় শুধু আখিরাতের ওয়া'দা সম্পর্কিত বিষয়ই উল্লেখ করে থাকেন। যেমন– আখিরাতের 'আযাব অত্যন্ত কঠিন এবং অপরদিকে সে কাজের প্রতিদানে সাওয়াবও বৃহত্তর এবং তা-ই হল (মু'মিনদের জন্য) স্থায়ী বাসস্থান। আর দুনিয়ার যে সকল প্রতিদান ও শাস্তির কথা উল্লেখ করেন, সেটা আখিরাতের সাথে এসে যায় বলেই উল্লেখ করেন। যেমন– ইউসুফ ('আ.)-এর ঘটনায় আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

﴿وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ ج يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ط نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۞ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ع﴾

"এবং এভাবে আমরা ইউসুফের জন্য এ পৃথিবীতে স্থান করে দিলাম (সুবিধা করে দিলাম), সে তার যেখানে ইচ্ছা সেখানেই অবস্থান গ্রহণ করবে। আমাদের অনুগ্রহ যাকে আমরা ইচ্ছা করব, তাকেই পৌঁছাব। অথচ নিষ্ঠাবান ও সৎকর্মশীলদের কাজের মূল্য আমরা নষ্ট করি না। আসলে যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহ্‌কে মূলতঃ ভয় করে তাদের জন্য পরকালের পারিশ্রমিকই উত্তম।" (সূরা ইউসুফ ১২ : ৫৬-৫৭)

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা আরও বলেছেন :

﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ط وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لا ۞ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾

"আর যারা যুল্‌ম নিপীড়নের নির্যাতন ভোগ করার পর হিজরাত করেছে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানের জন্য, আমরা তাদেরকে অবশ্যই এ পৃথিবীতে উত্তম পুনর্বাসন দান করব। উপরন্তু পরকালের পুরস্কারই হল সুবৃহৎ, যদি তারা জানতে পারত। তারা তো ঐ সকল লোক যারা ধৈর্য ধারণ করত এবং একমাত্র তাদের প্রতিপালকের প্রতি নির্ভর করত।"

(সূরা আন্‌-নাহ্‌ল ১৬ : ৪১-৪২)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইব্‌রাহীম ('আ.) সম্পর্কে বলেছেন :

﴿وَاٰتَيْنٰهُ اَجْرَهٗ فِى الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ﴾

"আমরা এ পৃথিবীতেই তাঁকে তাঁর পারিশ্রমিক প্রদান করেছি। আবার নিঃসন্দেহে তিনি আখিরাতেরও সৎ ও যোগ্য লোকদেরই অন্তর্ভূক্ত থাকবেন।" (সূরা আল-'আন্‌কাবূত ২৯ : ২৭)

আর তিনি যে, দুনিয়া ও আখিরাতের শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন, যেমন সূরা আন্‌ না-যি'আত এ বলেছেন :

﴿وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ۙ ۝ وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ۙ﴾

"শপথ ঐ সকল ফেরেশ্‌তাদের, যারা (পাপীদের পলায়ন পর) প্রাণ টেনে বের করে। আরও শপথ ঐ সকল ফেরেশ্‌তাদের, যারা মৃদুভাবে (সৎ লোকদের) প্রাণ বের করে নেয়।" (সূরা আন্‌ না-যি'আত ৭৯ : ১-২)

অতঃপর বলেছেন :

﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۙ ۝ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ؕ﴾

"সেদিন এক কম্পনকারী বস্তু প্রকম্পিত করবে যার পর আর এক পশ্চাদগামী বস্তু এসে পড়বে।" (সূরা আন্‌ না-যি'আত ৭৯ : ৬-৭)

সাধারণভাবে কিয়ামাত দিবসের বর্ণনা প্রসঙ্গে আরও বলেছেন :

﴿هَلْ أَتٰكَ حَدِيثُ مُوسٰى ۘ إِذْ نَادٰهُ رَبُّهٗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۚ اذْهَبْ إِلٰى فِرْعَوْنَ إِنَّهٗ طَغٰى ۖ فَقُلْ هَلْ لَّكَ إِلٰى أَنْ تَزَكّٰى ۙ وَأَهْدِيَكَ إِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى ۚ فَأَرٰهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى ۖ فَكَذَّبَ وَعَصٰى ۖ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعٰى ۖ فَحَشَرَ فَنَادٰى ۖ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلٰى ۖ فَأَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْأُوْلٰى ؕ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ؕع﴾

"আপনার কাছে মূসার বিবরণ পৌঁছেছে কী? যখন তার প্রতিপালক তাকে পবিত্র তুয়া উপত্যকায় আহ্বান করে বলেছিলেন ঃ ফির'আওনের কাছে যান, সে তো সীমালঙ্ঘন করেছে, এবং বলুন ঃ তোমার কি পবিত্র হওয়ার আগ্রহ আছে? আর আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের দিকে পথপ্রদর্শন করছি, যাতে তুমি তাঁকে ভয় কর। অতঃপর মূসা ফির'আওনকে মহা নিদর্শন দেখালেন। ফির'আওন অবিশ্বাস করল এবং অবাধ্য হল। তারপর সে ফিরে গিয়ে মূসার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে লাগল। সে লোকদেরকে একত্র করল এবং দৃপ্তকণ্ঠে আহ্বান করল, আর বলল ঃ আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক। অবশেষে আল্লাহ্ তাকে পাকড়াও করলেন আখিরাতের ও দুনিয়ার শাস্তিতে। নিশ্চয় এতে রয়েছে শিক্ষা তার জন্য, যে ভয় করে (আল্লাহ্কে)।" (সূরা আন্ না-যি'আত ৭৯ : ১৫-২৬)

এরপর মানব সৃষ্টির প্রারম্ভ ও প্রত্যাবর্তনস্থলের বিশ্লেষণাত্মক বর্ণনায় বলেছেন :

﴿ ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاءُ ط بَنٰهَا قفة ﴾

"(হে মানব জাতি)! তোমরাই সৃষ্টির দিক হতে বেশি কঠিন, না-কি আকাশ বেশি কঠিন? যাকে (আল্লাহ) সৃষ্টি করেছেন।"

(সূরা আন্ না-যি'আত ৭৯ : ২৭)

শেষ পর্যন্ত তিনি বলেছেন :

﴿ فَاِذَا جَآءَتِ الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى ز ﴾

"আর যখন সে মহাবিপদ এসে পড়বে"– (সূরা আন্ না-যি'আত ৭৯ : ২৭)। এমনকি শেষ পর্যন্ত বলেছেন :

﴿ فَاَمَّا مَنْ طَغٰى لا ۝ وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا لا ۝ فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَاْوٰى ط ۝ وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى لا ۝ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى ط ﴾

"আর যারাই (আল্লাহ্র নির্ধারিত) সীমালঙ্ঘন করেছে এবং ইহকালীন জীবনকে পরকালীন অনন্ত জীবনের উপর প্রাধান্য দিয়েছে তাদের জন্য "জাহীম" নামক দোযখ্ই হবে বাসস্থান। আর অপর পক্ষে যে নিজের রবের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে অর্থাৎ– পরলোক বিশ্বাস থাকার দরুন বিচার হতে ভীত থেকে সীমালঙ্ঘন (হতে ও বিরত রয়েছে) এবং আত্মাকে প্রবৃত্তি হতে নিবৃত্ত রয়েছে, তবে জান্নাতই হবে তার বাসস্থান।" (সূরা আন্ না-যি'আত ৭৯ : ৩৭-৪১)

এভাবে এ সূরা শেষাবধি এ বর্ণনাই এসেছে। অনুরূপভাবে সূরাতুল মুয্যাম্মিলেও বলেছেন ঃ

﴿وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ۞ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا ۞ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ۞ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۞ فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا﴾

"আর আমাকে ও সে সুখ-সম্পদে নিমগ্ন অধিবাসীদেরকে ছেড়ে দিন, আর তাদেরকে আরও কিছুদিন অবকাশ দিন, নিশ্চয়ই আমার নিকট বেড়ীসমূহ ও প্রজ্জ্বলিত অগ্নি রয়েছে এবং গলায় আটকানোর মত খাদ্য ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আরও বলেছেন : যেমন আমি ফির'আওনের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করেছিলাম। অনন্তর ফির'আওন সে রাসূলের কথা অমান্য করল। অতঃপর আমি তাকে কঠোরভাবে পাক্ড়াও করলাম।

(সূরা আল-মুয্যাম্মিল ৭৩ : ১১-১৬)

এমনভাবে সূরা আল হা-ক্বাহ্তে বিভিন্ন জাতিসমূহ যথা– সামূদ, 'আদ এবং ফির'আওনের কাহিনীর অবতারণা করেছেন। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেছেন (জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে)–

﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ۞ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً﴾

"অনন্তর যখন সিঙ্গায় একবার ফুঁৎকার দেয়া হবে এবং যমীন ও পর্বতমালাকে নিজ নিজ স্থান হতে উত্তোলিত করা হবে। অতঃপর উভয়কে

একেবারেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলা হবে”– (সূরা আল-হাক্কাহ্ ৬৯ : ১৩-১৪)। এভাবে শেষ পর্যন্ত জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপভাবে সূরা নূন ওয়াল্ কালামে সে অপরাধী (বাগানের বা শষ্য ক্ষেতের) মালিকদের কাহিনী বর্ণনা করেছেন, যারা তাদের ধন-সম্পদের হক আদায় করতে অস্বীকার করেছিল। ফলে আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলেন। এসব বর্ণনার পর বলেছেন :

﴿ كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ۖ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ ﴾

“এভাবেই এরূপই ‘আযাব হয়ে থাকে এবং পরকালের ‘আযাব এটা অপেক্ষা গুরুতর। যদি এরা জানত।” (সূরা আল-কালাম ৬৮ : ৩৩)

সূরা আত্-তাগাবুন-এও আল্লাহ তা‘আলা পাপীদের সম্পর্কে বলেছেন :

﴿ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۞ ذٰلِكَ بِاَنَّهٗ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوْٓا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا ز فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا وَّاسْتَغْنَى اللّٰهُ ط وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴾

“তোমাদের নিকট কি ঐ সমস্ত লোকদের সংবাদ পৌছেনি, যারা কুফরী করেছে। অতঃপর তারা তাদের কৃতকর্মের কঠোর পরিণতি (ইহজগতেও) আস্বাদন করেছে? আর পরজগতেও তাদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি রয়েছে। এটা এ কারণে যে, তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণাদি সহ যখন তাদের নিকট আসলেন তখন তারা বলল, তবে কি মানুষ আমাদেরকে হিদায়াত করবে? ফলকথা তারা কুফ্রী করল এবং পরান্মুখ

হল, আর আল্লাহ (ও তাদের কোন) পরওয়া করেননি আর আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, প্রশংসনীয়।" (সূরা আত্-তাগাবুন ৬৪ : ৫-৬)

এরপর আল্লাহ তা'আলা আবারও বলেছেন :

﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن لَّن يُبْعَثُوا ۚ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾

"কাফিররা এ দাবী করে যে, তাদেরকে কখনও পুনর্জীবিত করা হবে না;-আপনি বলে দিন, কেন করা হবে না? আল্লাহ্‌র কসম! নিশ্চয়ই তোমাদেরকে আবার জীবিত করা হবে, অনন্তর তোমরা যা কিছু করেছ, সমস্তই তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে। আর এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে খুবই সহজ?" (সূরা আত্-তাগাবুন ৬৪ : ৭)

আর অনুরূপই সূরা কাফ এ নাবী-রাসূলগণের বিরুদ্ধে বিরোধিতাকারীদের অবস্থা উল্লেখ করেছেন এবং আখিরাতের পুরস্কারও শাস্তি ধমকিরও বিবরণ দিয়েছেন।

তদানুরূপ সূরা আল-কামারে এটা সবই উল্লেখ করেছেন। যেমন- "হা-মীম" জাতীয় সূরাগুলোতে যথা- "হা-মীম, গাফির", "আস্-সাজদাহ্," "আল-যুখরূফ" "আদ্-দুখান" ইত্যাদি, যার কোন ইয়ত্তা নেই।

আসলে নিশ্চয়ই এক আল্লাহ্‌র একত্ববাদ, প্রতিশ্রুতি ও ভীতিপ্রদর্শনই হল প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ বিষয়াদির অন্তর্গত। যেমন- সহীহুল বুখারী গ্রন্থে ইউসুফ বিন মা-হিক হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন : আমি একদা বিশ্বাসীগণের মাতা 'আয়িশাহ্ (রাযি.)-এর নিকটে ছিলাম। এমন সময় একজন ইরাকবাসী তাঁর নিকট উপস্থিত হয়েই জিজ্ঞেস করলেন : কোন্ ধরনের কাফন অত্যুত্তম? জওয়াবে 'আয়িশাহ্ (রাযি.) বললেন : (আদর

ভরে "ওয়াইহাকা" অর্থ তোমার ধ্বংস হোক, আসলে দু'আ) তোমার মঙ্গল হোক– (কাফনের ভাল-মন্দে) তোমার ক্ষতি কোথায়? লোকটি বলল : হে উম্মুল মু'মিনীন! আপনার মুস্হাফ্ (কুরআনের কপি) খানা আমাকে দেখান। তিনি ('আয়িশাহ্) বললেন : কেন? লোকটি বলল : হয়তঃ সেটার অনুসরণে আমি কুরআন গ্রন্থনা করব। কেননা, সেটা গ্রন্থনা ব্যতীতই পাঠ করা হচ্ছে। তিনি ('আয়িশাহ্) বললেন : ইতোপূর্বে ঐ কুরআনের যে অংশই আগে পড়ে থাক না কেন, তাতে তোমাকে ক্ষতি করবে কিসে? (অর্থাৎ– বিনা গ্রন্থনায় কুরআন পাঠে অসুবিধা কি?) আসলে সেটার (কুরআনের) প্রথম যা কিছু নাযিল হয়েছিল, তন্মধ্যে মুফাস্সাল সূরাসমূহের একটি সূরা, যাতে বেহেশ্ত ও দোযখের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

অতঃপর যখন মানুষ ইসলামের আকর্ষণে সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ইসলামের প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তখন হালাল-হারাম (তথা বৈধাবৈধ নীতি) অবতীর্ণ করা হয়। আর যদি প্রথমেই নাযিল হত : "لَا تَشْرَبُوْا الْخَمْرَ।" "তোমরা মদপান করো না" তাহলে লোকেরা বলত আমরা কস্মিনকালেও মদপান ছাড়তে পারব না। আবার যদি প্রথমেই নাযিল হত "তোমরা ব্যভিচার করো না" তাহলে তারা সেটার জওয়াবে বলত– আমরা কখনও ব্যভিচার পরিত্যাগ করব না। আমি যখন ছোট্ট বয়সের শিশুকন্যা, তখনও খেলা-ধূলা করি, তখন মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি মাক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল–

﴿بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ﴾

"বরং কিয়ামাত তাদের জন্য প্রতিশ্রুত রয়েছে, আর কিয়ামাত বড় কঠোর ও তিক্তকর।" (সূরা আল-কামার ৫৪ : ৪৬)

আর সূরা আল-বাকারাহ্ ও আন্-নিসা– যে নাযিল হয়েছে তখন তো আমি রাসূল ﷺ -এর পাশেই ছিলাম। তখন লোকটি বলল : এ সময়

'আয়িশাহ্ (রাযি.) তার জন্য আল-কুরআনের কপিখানা বের করলেন এবং তার সামনে সূরার কতগুলো আয়াত পড়লেন (যেন শ্রুতলিপি লিখাচ্ছেন)।
(বুখারী : কিতাবু ফাযায়িলে আল-কুরআন)

যখন কুফ্‌রী, ফাসিকী ও অবাধ্যাচরণ, অমঙ্গল ও শত্রুতার কারণ পরিব্যপ্ত হয়, এমতাবস্থায় ব্যক্তি ও গোষ্ঠী পাপকাজ করবে আর অন্যান্যগণ সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করা হতে চুপ থাকবে, আর সেটাও তাদের গুনাহের মধ্যেই গণ্য হবে এবং অন্যরা তাদের এ আচরণকে এমনভাবে ঘৃণা করবে যা হতে নিষেধ করা হয়েছে। সেটা ও তাদের গুনাহের মধ্যেই গণ্য হবে। আর তখনই দলাদলি, মতপার্থক্য এবং অনিষ্ট সাধিত হতে থাকবে।

আর এটাই তো অধুনা ও পুরাকালের সর্ববৃহৎ ফিত্‌নাহ্ ও অকল্যাণ। এখানেই প্রমাণিত হল যে, মানুষ জাতি সাংঘাতিক অত্যাচারী এবং যারপরনাই মূর্খ। অত্যাচার ও অজ্ঞতা বিবিধ প্রকার। দেখুন প্রথম দল (যারা পাপকাজ করে তাদের) অত্যাচার ও অজ্ঞতা হবে এক প্রকারের। অপরপক্ষে দ্বিতীয় দল (যারা সৎকাজের আদেশ করা ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করা হতে চুপ থাকে) ও তৃতীয় দল (যারা ঐ পাপীদের প্রতি অতিরিক্ত মাত্রায় ঘৃণা প্রদর্শন করে থাকে) তাদের প্রত্যেকের অত্যাচার ও মূর্খতা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে।
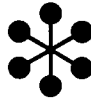
তাদের অনুসরণে ফিত্‌নার কারণসমূহ

আসলে যে ব্যক্তি সংঘটিত ফিত্‌নাসমূহকে ভালভাবে অনুধাবন করে দেখতে পেয়েছে যে, ঐগুলোই সেটার কারণ এবং জাতির আমীর 'উমরাহ্‌গণও 'আলিমগণের মধ্যে যা ঘটছে তাও দেখতে পেয়েছে। আরও দেখতে পেয়েছে যে, জাতির রাজা বাদ্‌শাহ্ ও শাইখ– মাশায়েখ্‌গণের কারা ঐ ফিত্‌নায় প্রবেশ করেছে আর তাদেরকে অনুসরণ করেই বা কারা উক্ত ফিত্‌নায় পতিত হয়েছে। এটাই ঐ ফিত্‌নাহ্‌র মূল কারণ। তদুপরি বিপথগামিতা ও পথভ্রষ্টতার কারণসমূহও সেটারই অন্তর্গত। যেমন– ধর্মীয় বিষয়ে যথেচ্ছাচারিতা এবং রিপুবৃত্তি, ধর্মে বিদ'আত আনয়ন ও পৃথিবীতে পাপাচার করা। আর সেটা এজন্য যে, পথভ্রষ্টতার কারণসমূহ যা ধর্মীয় বিষয়ে নতুন কিছুর সংযোজন এবং দুনিয়াতে পাপাচার অনুষ্ঠান : সেটা সম্মিলিত এবং আদম সন্তানদের মধ্যে যুল্‌ম ও মূর্খতা থাকার কারণে আদম সন্তানদের সকলকেই সংশ্লিষ্ট করে থাকে। এরূপে কোন কোন মানুষ স্বীয় নাফ্‌সের যুল্‌মের কারণে এবং অন্যের যুল্‌মের কারণেও গুনাহ্ করে থাকে– হয় ব্যভিচারের মাধ্যমে অথবা পুরুষে পুরুষে হীনরিপু চরিতার্থ করার মাধ্যমে অথবা অন্য কোন উপায়ে বা মদপানের মাধ্যমে। অথবা সম্পদের যুল্‌ম যেমন আমানতে খিয়ানাত, অথবা পরের সম্পদ হরণ বা ছিনতাই অথবা এরূপ কোন অবৈধ উপায়ে সেটা আত্মসাৎ করে।

এ কথা সর্বজনবিদিত যে, যদিও এ সকল পাপাচারই ধর্মীয়ভাবে ও জ্ঞানের কাছে ঘৃণিত ও অপ্রসংশিত– তবুও স্বাভাবিকভাবে আত্মা ও রিপুর কাছে সেটা বড়ই স্বাদের। ওদিকে নাফ্‌সসমূহের অবস্থা হল এই যে, কোনও জিনিস অন্য কারও জন্য বিশেষভাবে নির্ধারিত হোক বা অন্য কেউ সেটার চাইতে এতটুকুও বেশির অধিকারী হোক, এরা কখনও সেটা পছন্দ করবে না বরং নাফ্‌স চাইবে যে অন্যের যা লাভ হয়েছে নিজের জন্যও তা অর্জিত হোক। আর এটাই হল "গিব্‌তাহ্" (কোন কিছু লাভ করতে

মানসিক প্রতিযোগিতা) যা দ্বিবিধ পরশ্রীকাতরতার মধ্যে নিকৃষ্টতর। কেননা নাফ্স সর্বদাই অন্যের উপর স্বীয় প্রাধান্য ও আধিপত্যের আকাঙ্ক্ষাই করে থাকে এবং অন্যকে ব্যতীত আপনাকে অগ্রগণ্য মনে করে ও ঈর্ষান্বিত হয়ে পরের প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্য বিলীন হয়ে যাক এ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে থাকে; যদিও সেটা অর্জিত না-ই হোক। আর তাতেই রয়েছে উচ্চাভিলাষ ও অনাসৃষ্টির উদগ্র বাসনা ও পরশ্রীকাতরতার কারণ হল এমন বাসনা যে, কোন ব্যাপারে কাম-বাসনা চরিতার্থ করতে অন্য কাউকেও ছাড়া এককভাবে তাতে বিশেষায়িত হওয়া। তবে যখন এরূপ নাফ্স দেখবে যে অন্য কেউ ঐ ইঙ্গিত ব্যাপারে ইতোমধ্যেই স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করে এবং ঐ বিষয়ে নিজেকে এককভাবে বিশেষিত ও অধিকারী করে নিয়েছে, তখন ব্যাপারটি কেমন হবে? আসলে ঐ বিষয়ে তাদের মধ্যে মধ্যপথ অবলম্বনকারী হবে সে ব্যক্তি যিনি অংশীদারিতা ও সমতা পছন্দ করে থাকেন। তিনি ভিন্ন অন্যজন : সে হল সাংঘাতিক যুল্মকারী ও অতিশয় ঈর্ষাকাতর।

আর এরা দু'জনই আল্লাহ্‌র হকের ব্যাপারে অনুমোদিত বিষয়াদির মধ্যে পতিত হবে, আবার কখনও নিষিদ্ধ বিষয়েও পড়ে যাবে।

সুতরাং যে সকল বিষয় মৌলিকভাবে মুবাহ্ (যা গ্রহণে বাধা নেই) যেমন– পানাহার, বিবাহ্, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাহনে আরোহণ, ধন-সম্পদ ইত্যাদিতে যখন কারও জন্য নির্দিষ্টকরণ সংঘটিত হবে, তখনই তারই ফলে সংঘটিত হবে অত্যাচার, কার্পণ্য ও ঈর্ষা।

আর মূলে রয়েছে অতিশয় অর্থের প্রতি লালসা। যেমন– বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (ﷺ) বাণী প্রদান করেছেন :

إياكم والشُّحَّ فإنه أهلك من كان قبلكم أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالظلم فظلموا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا.

"তোমরা সম্পদলিপ্সার কাছেও যেও না (সম্পদ-লিপ্সা হতে বেঁচে থাকো) কেননা নিশ্চয়ই সেটা তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করে ফেলেছিল। সম্পদলিপ্সা তাদেরকে কৃপণতা করতে আদেশ দিয়েছিল, ফলে তারা কার্পণ্যই করেছিল, সেটা তাদেরকে যুল্ম-নির্যাতনের নির্দেশ দিয়েছিল, ফলে তারা (অর্থ লোভে মোহান্ধ হয়ে) যুল্ম-নির্যাতনই করেছিল। অর্থলোভ তাদেরকে আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদ করতে আদেশ করেছিল, এতে তারা সম্পর্কচ্ছেদও করেছিল।"

(আবূ দাঊদ : ২/১৩৩; মুসলিম : ২৫৭৮; ইবনে হাম্বাল : ১/১৯১; তাফসীর ইবনে কাসীর : ৪/২৩৯)

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِىْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ط وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ج﴾

"আর যারা দারুল ইসলামে (অর্থাৎ– মাদীনায়) ঈমানকে ভালবেসে তাদের (মুহাজিরদের আগমনের) পূর্ব হতেই অটল রয়েছে, যারা তাদের নিকট হিজরাত করে আসে, তাদেরকে এরা ভালবাসে, আর মুহাজিরগণ যা প্রাপ্ত হয় এরা তজ্জন্য নিজেদের মনে কোন ঈর্ষা পোষণ করে না, এবং অন্যকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দান করে, যদিও তারা ক্ষুধার্তই থাকে আর যে নিজের স্বাভাবিক কৃপণতা হতে রক্ষিত থাকে, এরূপ লোকেরাই সুফলপ্রাপ্ত হবে।" (সূরা আল-হাশ্‌র ৫৯ : ৯)

একদা 'আবদুর রহমান বিন 'আওফ (রাযি.) বাইতুল্লাহ্ শারীফের প্রদক্ষিণকালে কাউকে বলতে শুনেন–

ربِّ قني شح نفسي ربِّ قني شح نفسي.

"হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আমার অন্তরের কৃপণতা (সম্পদ-লিপ্সা) হতে রক্ষা করুন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আমার অন্তরের কৃপণতা (সম্পদ-লিপ্সা) হতে রক্ষা করুন।"

অতঃপর তাকে ঐ বিষয়ে বলা হলে সে বলল :

إذا وقيت شح نفسي فقد وقيت البخل والظلم والقطيعة.

أوكما قال،

"যদি আমি আমার অন্তরের কার্পণ্য হতে রক্ষা পাই, তবেই আমি কৃপণতা, যুল্‌ম ও আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদ করা হতে রক্ষা পাব। অথবা যেভাবে তিনি বলেছেন।"

অতএব এই যে সম্পদের প্রতি লিপ্সা– যা অন্তরের অতিমাত্রায় লোভ– তা ব্যক্তিকে তার করণীয় কাজ হতে ফিরিয়ে রেখে কৃপণতায় বাধ্য করে, পরের সম্পদ হরণের মাধ্যমে যুল্‌ম করতে বাধ্য করে, নিকটাত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে বাধ্য করে এবং ঈর্ষাপরায়ণ করে তোলে– সেটা হল, অপর ব্যক্তি যার অধিকারী হয়েছে তাকে অপছন্দ করা ও তার বিনাশ কামনা করা। আসলে পরশ্রীকাতরতার মধ্যে কৃপণতা ও যুল্‌ম বিদ্যমান। কেননা তাকে ছাড়া অন্যকে যা দেয়া হয়েছে ঐ সম্পর্কে সে কৃপণতা করেছে এবং ঐ ব্যক্তির নিকট হতে ঐ সম্পদ বিলীন হয়ে যাক, এ আকাঙ্ক্ষা করে সে যুল্‌ম করেছে।

(এখন দেখুন) প্রবৃত্তির বৈধ চাহিদার ক্ষেত্রেই যখন এ অবস্থা, তখন অবৈধ লোভনীয় বিষয় যেমন– ব্যভিচার, মদপান ও অনুরূপ কিছু হলে

কেমনটি হবে? আর যখন তাতে ব্যক্তি ভিত্তিক কারণ সংঘটিত হবে তখন তাতে দু'প্রকারের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। তাদের– প্রথমটি: তাতে যে একক অধিকার ও যুল্‌ম রয়েছে তজ্জন্য তাকে ঘৃণা করা, যেমনটি ঘটে থাকে মৌলিকভাবে বৈধ বিষয়গুলোতে।

দ্বিতীয়টি: সেটার মধ্যে যে, আল্লাহ্‌র হক রয়েছে এজন্য তাকে ঘৃণা করা। আর ঠিক এ জন্যই গুনাহ্ (অপরাধ) তিন প্রকার যথা : প্রথমত: যাতে মানুষের উপর যুল্‌ম করা রয়েছে। যেমন– সম্পদ হরণ, হকসমূহ (প্রাপ্য) প্রদানে অস্বীকৃতি ও হিংসা ইত্যাদির মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত: যাতে আত্মার প্রতি অত্যাচার (যুল্‌ম) হয়ে থাকে, যেমন– মাদকদ্রব্য পান করা ও ব্যভিচার করা, যদি না সেটার ক্ষতিসমূহ সীমাতিক্রম করে। তৃতীয়ত: যাতে উভয়বিধ দু'টি বিষয়ই একত্র হতে পারে–

❊ যেমন কোন প্রতিষ্ঠানের মুতাওয়াল্লী (অভিভাবক) সাধারণ মানুষের জমাকৃত টাকা-পয়সা ব্যভিচার ও মদপান করার জন্য আত্মসাৎ করবে।

❊ এবং এমন ব্যক্তির দ্বারা ব্যভিচার করাবে (ব্যভিচার করার অবাধ সুযোগ করে দিবে) যিনি এটার বদলা হিসেবে তাকে মানুষের মধ্যে উচ্চাসনে সমাসীন করে দিতে পারবেন ও আপামর জনতার ক্ষতি সাধন করতে পারবেন। যেমনটি ঘটে থাকে ঐসব লোক দ্বারা যারা এক ধরনের স্ত্রীলোক ও কিশোরদেরকে পছন্দ করে থাকে। এ সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেছেন :

﴿قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّ اَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَاتَعْلَمُوْنَ﴾

"আপনি বলে দিন, অবশ্য আমার রব তো হারাম করেছেন বিশেষ করে সকল নির্লজ্জ কাজ-কর্মসমূহকে, তন্মধ্যে যেগুলো প্রকাশ্য তাকেও এবং যেগুলো অপ্রকাশ্য তাকেও এবং সকল প্রকার পাপ কর্মকে এবং অন্যায়ভাবে কারও উপর অত্যাচার করাকে, আর একে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে কোন এমন বস্তুতে শরীক সাব্যস্ত কর যার সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেননি। আর তাকে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি এমন কথা আলাপ কর যার কোন প্রমাণ তোমাদের নিকট নেই।"

(সূরা আল-আ'রাফ ৭ : ৩৩)

মানুষের কার্যক্রম ন্যায়পরায়ণতা ব্যতীত পরিপূর্ণ হতে পারে না

অধিকার খর্ব করার (যুল্‌মের) মাধ্যমে পৃথিবীতে মানুষের সার্বিক অবস্থা (কর্মকাণ্ড) যতটুকু হয়ে থাকে, তার হতে (অনেক) বেশি পরিপূর্ণ হয়ে থাকে ন্যায়পরায়ণতার মাধ্যমে, যাতে হয়তঃ বা কিছু কিছু ছোট-খাটো ত্রুটি-বিচ্যুতির সমন্বয় ঘটে থাকে। সুতরাং কথিত আছে যে, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রকে প্রতিষ্ঠিত করে থাকেন, যদিও তা কাফির হয়ে থাকুক না কেন! আর যালিম রাষ্ট্রকে প্রতিষ্ঠিত করেন না। হোক না সেটা মুসলিম রাষ্ট্র!!

কথায় বলে–

الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولاتدوم مع الظلم والإسلام.

"এ পৃথিবী ন্যায়বিচার ও কুফ্‌র নিয়ে চলতে পারে; কিন্তু ইসলাম ও যুল্‌ম নিয়ে চলতে পারে না।"

নাবী ﷺ বলেছেন :

ليس ذنب أسرع عقوبة من البغى وقطيعة الرحم.

"আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা ও অবাধ্যতার চাইতে অতি ত্বরিত শাস্তি আনয়নের মত পাপ আর নেই"– (হাসান সহীহ্: আত্-তিরমিযী; ইবনে মাজাহ্, ইবনে হাম্বল : ৫/৩৬)। অবাধ্যচারীকে তো দুনিয়াতেই হত্যা করা হয়ে থাকে যদিও সে পরকালে ক্ষমাপ্রাপ্ত ও অনুকম্পা প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

সেটা এজন্য যে, প্রত্যেক জিনিসের আইনই হল ন্যায়পরায়ণতা (নীতিই হল ন্যায়পরায়ণতা)। অতএব (দেখা যাবে যে,) যদি দুনিয়ার বিষয়াদি ন্যায়নীতির সাথে পালিত হয় তাহলে দুনিয়াও ন্যায়ভাবে চলতে

থাকে, যদিও ঐ ন্যায়বান লোকটির জন্য আখিরাতে কোন প্রাপ্যই না থাকে। আর যখন দুনিয়ার কোন বিষয়াদি ন্যায়নীতির মাধ্যমে পালিত না হয়, তবে দুনিয়াও ন্যায়ভাবে চলে না, যদিও সেটার অধিকারীর এমনও ঈমান থাকে, যার বদলা আখিরাতে পাবে।

সুতরাং নাফ্স এ পৃথিবীতে অন্যের প্রতি হিংসা, অন্যের প্রাপ্যের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন ও অন্যের উপর আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে যুল্ম-অত্যাচারের (প্রকৃত) হোতা। এটা ছাড়াও কু-মনোবৃত্তিও বাসনা চরিতার্থ করতে অশ্লীল বিষয়সমূহ যেমন– ব্যভিচার, হারাম খাবার গ্রহণের দ্বারা নাফ্স নিজের উপর যুল্মের আহবায়ক। হয়তঃ বা যে তাকে যুল্ম করে না সেও তার উপর অত্যাচার করে না এবং এসব রিপুগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে যদিও সে ছাড়া আর কেউ-ই সেটা করে না। নাফ্স যখন দেখতে পাবে যে, সেটার সমপর্যায়ের অন্যান্যরা ইতোমধ্যেই যুল্ম করেছে, অথবা কু-মনোবৃত্তিগুলো গ্রহণ করেছে তখন সে স্বয়ং এ সকল কু-মনোবৃত্তি গ্রহণ করার ও অত্যাচার করার জন্য পৃথিবীতে অনেক বড় আহ্বায়ক হয়ে বসবে।

অপরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ, তার শাস্তির দাবী, তার ঐশ্বর্য বিলীন হবার আকাঙ্ক্ষা ও তার প্রতি ঘৃণায় সে আস্ফালন করতে থাকবে এবং এমনরূপ ধারণ করবে যে ইতোপূর্বে আর কখনও তেমন হয়নি। তখন সেটার (নাফ্স) নিজের কাছে জ্ঞান ও ধর্মীয় দিক হতে প্রমাণ মওজূদ থাকবে। সেটা হবে এই যে, ঐ অপরাপরগণ নিজেদেরও মুসলিম জনগণের উপর অত্যাচার করেছে আর তখন তার সৎকাজে আদেশ দান, অসৎকাজ হতে নিষেধ করা ও জিহাদ করা, দীনের অন্তর্গত।

আদেশ দান ও নিষেধ করার ক্ষেত্রে মানুষের শ্রেণীসমূহ

এক্ষেত্রে মানুষ ত্রিবিধ :

এক সম্প্রদায়, তাদের নাফ্সসমূহের চাহিদা ব্যতিরেকে তারা কিছুই করবে না। তাদেরকে যা দেয়া হবে, তা ছাড়া তারা সন্তুষ্ট হবে না। আবার তাদেরকে যা হতে বঞ্চিত করা হবে, তা ব্যতীত (অন্য কোন কারণে) তারা রাগও করবে না। আর যখন তাদের কাউকেও তার প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী-তা হারাম হোক বা হালাল হোক দেয়া হবে (দেখবে) তার রোষাগ্নি নির্বাপিত হয়ে গেছে এবং সাথে সাথে সে খুশিও হয়ে গেছে। আর ক্ষণিক পূর্বেও যে বিষয়টি তার নিকট অসৎ ছিল সেটা হতে নিষেধ করত, সেটা করার কারণে শাস্তি দিত, সেটা যে করত তাকে ভর্ৎসনা করত, এখন সে স্বয়ং সেটার কর্তাব্যক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেটা সম্পাদনে সে নিজেও শরীক ও সহযোগী এবং যে সেটা হতে নিষেধ করবে ও তাকে ঘৃণা করবে তার ঘোর শত্রু হয়ে উঠেছে।

এরূপ অবস্থা আদম সন্তানদের মধ্যেই বেশি প্রবল। তুমি দেখে থাকবে, মানুষ সেটার ঘটনা এত শুনছে যে, আল্লাহ ছাড়া সেটার পরিসংখ্যান আর কেউই দিতে পারবে না।

সেটার কারণ হল যে, মানুষ আসলে অতিশয় যালিম ও অজ্ঞ। এজন্যই সে ন্যায়বিচার করে না। বরং সে হয়ত বা উভয়বিধ অবস্থাতেই অত্যাচারী। সে কোন রাজার হাতে প্রজা সাধারণের প্রতি অবিচার ও তাদের উপর সীমাহীন নির্যাতনের কারণে কোন সম্প্রদায়কে ঐ সম্প্রদায়ের হর্তাকর্তার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করতে দেখবে। অতঃপর ঐ রাজা ঐ সকল অনাস্থাবান লোকদেরকে যৎকিঞ্চিৎ দান-দক্ষিণা দিয়ে সন্তুষ্ট করে নিবে, অতঃপর তারা ঐ অত্যাচারী রাজার সাহায্যকারী হয়ে বসবে। তাদের অবস্থাসমূহের মধ্যে মজার বিষয় হল যে, তারা ঐ যালিমের প্রতি ঘৃণা

প্রকাশ করা হতেও বিরত (চুপ) থাকবে। অনুরূপভাবে (হে পাঠক!) তাদের কাউকেও কোন মদ্যপায়ী বা ব্যভিচারীর নিকটে দেখবে এবং গানবাদ্য শুনতে থাকবে, শেষ পর্যন্ত তারা তাদের সাথে একত্রে ঐ কাজে প্রবেশ করবে, অথবা সেটার কিছু অংশ দ্বারা তারা তাকে সন্তুষ্ট করে ফেলবে, তখন দেখবে যে, সে তাদের সাহায্যকারী হয়ে গেছে।

অন্য আর এক সম্প্রদায়, তারা সহীহ্ দীনী কাজ-কর্মই করে থাকে, এবং তাতে তারা একমাত্র আল্লাহ্র জন্য একনিষ্ঠভাবে এবং যা করে তাতে তারা একনিষ্ঠ হয়ে থাকে এবং ঐ কাজও তাদের জন্য বিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল হয়ে থাকে। এমন যে সকল ব্যাপারে তাদেরকে কষ্ট দেয়া হয় তাতে তারা ধৈর্যও অবলম্বন করে থাকে। আর আসলে ঐ সম্প্রদায়ই হল সেসব লোক, যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম সম্পাদন করেছে। আর ঐ সকল লোকই তো (উত্তম-উম্মাহ্) অতি উত্তম জাতি, যারা মানব জাতির মহা কল্যাণ সাধনের জন্য সৃজিত হয়েছে। তারাই সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করে থাকে এবং আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস রাখে।

আর এক সম্প্রদায়, যাদের মধ্যে এটাও তার সমাহার হয়ে থাকে। তারাই হল মু'মিনদের (বিশ্বাসীদের) বৃহত্তর অংশ।

যার অন্তরে দীন আছে, আরও আছে কাম্‌রিপু, আবার অন্তরে আল্লাহ্র আনুগত্যের বাসনাও আছে ও ওদিকে অবাধ্যচরণের ইচ্ছাও বিদ্যমান। তাই কখনও এ আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে যায় আবার কখনও ঐ বাসনা হয় বেশী প্রবল।

এ ত্রিবিধ বন্টনটা হল যেমন কথিত আছে নাফ্‌সসমূহ (আত্মা) তিনটি :

✳ নাফ্‌স আম্মারাহ্ : যা খারাপ কাজে উদ্বুদ্ধ করে।

✳ লাওয়ামাহ্ : যা বেশি বেশি ভর্ৎসনা করে।

✳ মুত্‌মাইন্নাহ্ : যা ভাল কাজে তৃপ্ত থাকে।

সুতরাং প্রথম শ্রেণীর লোক তারা যারা নাফ্‌সে আম্মারার অধিকারী, যা কু-কাজের জন্য বেশি আদেশ দিয়ে থাকে।

আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন ঃ

﴿يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۝ وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾

"মধ্যম দল আর মধ্যম দল তারা, যারা নাফ্‌সে মুত্‌মাইন্নার অধিকারী, যাকে সম্বোধন করে (কিয়ামাতের দিন আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে) বলা হবে– হে নাফ্‌সে মুত্‌মাইন্নাহ (অর্থাৎ– শান্তিময় আত্মা)! তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে চল এভাবে যে, তুমি তার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। অনন্তর তুমি আমার বিশিষ্ট বান্দাদের মধ্যে শামিল হয়ে যাও, আর আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।" (সূরা আল-ফাজ্‌র ৮৯ : ২৭-৩০)

আর ঐ সকল লোক হল বেশি ভর্ৎসনাকারী আত্মার অধিকারী যা পাপকাজ করে এবং তজ্জন্যই আবার ভর্ৎসনাও করে এবং রং-বেরং ধারণ করে। কখনও এরূপ, আবার কখনও বা সেরূপ এবং ভাল কাজসমূহের সাথে খারাপ কাজ মিলিয়ে ফেলে।

আর এজন্যই যখন মানুষ আবূ বাক্‌র (রাযি.) ও 'উমার (রাযি.)-এর যুগে ছিল– তাঁরা দু'জন তো এমন ছিলেন যে, তাঁদের আনুগত্য তথা অনুসরণ করার জন্য মুসলিমগণকে আদেশ দেয়া হয়েছিল। যেমন– নাবী ﷺ বলেছেন :

اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر.

"হে লোক সকল! আমার (অব্যবহিত) পরেই যে দু'জন আসবেন– আবূ বাক্‌র ও 'উমার– তাদের অনুসরণ করো।" (আবূ দাঊদ : ৫/১৩; কিতাবুস্ সুন্নাহ্ বাবু-ফি লাজুমিস্ সুন্নাহ্; আন্-নাসায়ী : ৫-৪৪, হাঃ নং– ২৬৭৬,

কিতাবুল 'ইল্‌ম, বাব-মাযায়া ফি আল-আখ্‌জি বিস্‌সুন্নাহ্‌; ইবনে মাজাহ্‌ : ১/১৫, আল-মুকাদ্দিমাহ্‌, বাব-ইত্তিবা-ই সুন্নাতিল খুলাফা-ইর রাশিদীন; আল-দারিমী : ১/৪৪, আল-মুকাদ্দিমাহ্‌-বাব-ইত্তিবা-ইস্‌ সুন্নাহ্‌; ইবনে হাম্বাল : ৪/১২৬-১২৭)

যখন মানুষ রিসালাত (নাবূওয়াতের)-এর অতি নিকটতম যুগে ছিল, ঈমান ও সততার দিক হতে ছিল সুমহান, তাদের নেতৃবর্গও দায়িত্ব পালনে অত্যধিক তৎপর ছিলেন এবং শান্তিময়তার ক্ষেত্রে ছিলেন বেশি স্থির। তখন ফিত্‌নাহ্‌-ফাসাদ ঘটেনি। ঐ সময় তারা মধ্যবর্তী দলের মধ্যে বিবেচিত হতেন।

যখন মানুষ 'উসমান (রাযি.)-এর খিলাফাতের শেষ পর্যায়ে ও 'আলী (রাযি.)-এর খিলাফাতের সময় ছিল তখন তৃতীয় শ্রেণীর লোক সংখ্যা বর্ধিত হয়ে গিয়েছিল, ঐ সময় মানুষের মধ্যে দীন ও ঈমান থাকা সত্ত্বেও আকাঙ্ক্ষা ও সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিল। সেটা কতিপয় প্রাদেশিক গভর্নর ও কিছু সংখ্যক প্রজা সাধারণের মধ্যেও সৃষ্টি হয়েছিল। অতঃপর সেটা ক্রমান্বয়ে (আরও বেড়ে) বেশি হয়ে পড়েছিল।

এভাবেই ফিত্‌নার সৃষ্টি হয়েছিল, যার কারণ একটু পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে– যেমন উভয় পক্ষেরই তাক্‌ওয়া (আল্লাহ্‌ভীতি) ও আনুগত্য অবলম্বন না করা, উভয় পক্ষেরই এক প্রকারের প্রবৃত্তি ও গুনাহের সাথে মধ্যম পন্থায় রাখা আর উভয় পক্ষই ছিল মনগড়া ব্যাখ্যার আশ্রয়গ্রহণকারী যে, সে সৎকাজের আদেশ করে এবং অসৎকাজ হতে নিষেধ করে থাকে এবং নিশ্চয়ই সে সত্য ও ন্যায়নীতির সাথে আছে। অথচ এরূপ মনগড়া ব্যাখ্যার সাথে এক প্রকারের মনোবৃত্তি রয়েছে। আর এটারই মধ্যে রয়েছে একটু কিছু সন্দেহ এবং মন যা চায় তারই আকাঙ্ক্ষা পোষণ। যদিও দু'পক্ষের একপক্ষ সত্যের (খিলাফাতের) জন্য অধিকযোগ্য ছিল।*

---

* এখানে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ্‌ (রহ.) স্পষ্ট করে বলেননি যে, কোন পক্ষ হকের দাবীতে বেশী যোগ্য ছিল। তবে আহ্‌লি সুন্নাত ওয়াল জামা'আত সর্বদাই আবূ বাক্‌র ও 'উমারের পর 'উসমান ও 'আলী (রাযি.)-গণকই যোগ্য মনে করে। (সম্পাদক)

অতএব বিশ্বাসী ব্যক্তির উচিত হল, সে যেন আল্লাহ্‌র কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করে এবং তার অন্তরকে ঈমান ও আল্লাহ্‌ভীতি দ্বারা আবাদ করে, অন্তরকে বক্র না করে তাক্‌ওয়া (আল্লাহ্‌ভীতি) ও হিদায়াতের উপর স্থির রাখে এবং সে যেন প্রবৃত্তির অনুসরণ না করে, এ সকল বিষয়ে আল্লাহ্‌রই উপর পূর্ণ আস্থা রাখে।

যেমন– আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

﴿فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ ۚ وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ۚ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ؕ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ؕ﴾

"অতএব আপনি সেদিকেই ডাকতে থাকুন এবং আপনাকে যেরূপ নির্দেশ দেয়া হয়েছে (তাতে) দৃঢ় থাকুন আর তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না, আর বলে দিন আল্লাহ যত কিতাব নাযিল করেছেন আমি তাতে ঈমান আনছি আর আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, তোমাদের মধ্যে ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত রাখি, আল্লাহ আমাদের ও মালিক এবং তোমাদেরও মালিক।"

(সূরা আশ্-শূরা ৪২ : ১৫)

এটাই হল জাতির অবস্থা ঐ সকল বিষয়ে, যাতে সেটা বহুধা বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং কথাবার্তা ও 'ইবাদাতে মতবিরোধ করেছে। এগুলো এমন সব বিষয়ের আওতাভুক্ত যার ফলে মু'মিনের উপর বিপদাপদ প্রকট হয়ে আসে। সুতরাং তারা দু'টি জিনিসের মুখাপেক্ষী :

☼ নিজের অভ্যন্তর হতে দুনিয়া ও ধর্মীয় ফিত্‌না যদ্বারা তাদের অনুরূপ লোকজন (পূর্বে) পরীক্ষিত হয়েছিল, সেটার কারণ থাকা সত্ত্বেও তাকে দূর করা। নিশ্চয়ই তাদের সাথে নাফ্‌সসমূহ ও শয়তান সকল রয়েছে, যেমন রয়েছে অন্যদের সাথেও। তাদের অনুরূপগণের নিকট সেটা

কারণ পেয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সেটার প্রকৃত কারণ তাদের নিকটই শক্তিশালী হয়ে উঠে। যেমন- সেটা বাস্তবেও সত্য। অতঃপর তার শয়তান ও শয়তানের অন্তরের আহ্বায়ক অবশিষ্ট থেকে যাবে। এমনভাবে ভাল (তথা পুণ্যসমূহ এবং অন্য ও তার সমতুল্য) কাজের আহ্বায়ক কর্তৃক যা সাধিত হবে তা যথারীতি অবশিষ্ট থাকবে।

অনেক এমনও লোক আছে যে, সে কোনও ভাল কাজ বা খারাপ কাজ অন্যকে বিশেষ করে সমতুল্যকে সেটা করতে না দেখা পর্যন্ত সেটা করতে হৃদয়ে কোন ইচ্ছাই পোষণ করে না, (যখন দেখে যে অন্য একজন সেটা করছে, তখন সেও সেটা করে) কেননা মানুষ ঠিক "কাতা" পাখীর ঝাঁকের ন্যায়, তারা পরস্পর অনুকরণের অভ্যাসের উপরই সৃষ্ট।

আর এজন্যই কোন ভাল বা মন্দ কাজের সূচনাকারী (তার) অনুকরণকারীদের সকলের সমান পুণ্য বা পাপের অধিকারী হবে। যেমন- নাবী ﷺ এ সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন-

من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيمة من غير ان ينقص من أجورهم شيئًا. ومن سن سنة سيّئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيمة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا.

"যে ব্যক্তি কোনও সুন্দর আদর্শের প্রচলন করবে সে সেটার প্রতিফল (সাওয়াব) তো পাবেই তদুপরি কিয়ামাত পর্যন্ত যারা তার অনুসরণে 'আমাল করবে তাদের সকলের সম্মিলিত 'আমালের সাওয়াবও ঐ প্রচলনকারী পাবে (অথচ) ঐ সকল অনুসরণকারীদের সাওয়াবে কোনরূপ ঘাটতি হবে না। অপরদিকে যে ব্যক্তি কোন খারাপ আদর্শের প্রচলন করবে সে সেটার ফলে পাপী তো হবেই তদুপরি কিয়ামাত পর্যন্ত যারা তার

অনুসরণে 'আমাল করবে তাদের সকলের সম্মিলিত পাপরাশির পরিমাণ পাপের দায়ীও সে ব্যক্তি হবে, (অথচ) ঐ সকল অনুসরণকারীদের পাপে এতটুকুও ঘাটতি হবে না।" (মুসলিম : কিতাবুল 'ইল্‌ম : ৮/৬১, কিতাবুয যাকাত : ৩/৮৭; আন্-নাসায়ী : ৫/৭৬; ইবনে হাম্বাল : ৪/৩৫৭-৩৫৯)

তা, যেহেতু তারা মৌলিক বিষয়ে শরীক হয়েছে এ কারণে। আর যেহেতু কোন জিনিসের জন্য সেটার সমতুল্য জিনিসের ব্যাপারে গৃহীত সিদ্ধান্তই প্রযোজ্য। কোন জিনিসের অনুরূপ বস্তু তারই দিকে আকর্ষিত হয়ে থাকে। সুতরাং যখন এ আহ্বানকারীদ্বয় শক্তিশালী হবে, তখন যদি আরও দু'জন আহ্বানকারী এসে তাদের সাথে মিলিত হয়ে সংগঠিত হয়, তবে এ অবস্থায় বিষয়টি কেমন দাঁড়াবে?

অসৎকাজের লোকেরা তাদের অনুসারীদের ভালবাসে

আর সেটা হল যে, খারাপ কাজের অনেক লোক তাদেরকেই ভালবাসে, যারা তাদের এ অবস্থায় থাকাকে গ্রহণ করে নিয়েছে, আর যারা তাদেরকে গ্রহণ করতে পারেনি তাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে। এ অবস্থা বাতিল ধর্মগুলোর মধ্যে (দিবালোকের মত) প্রকাশিত। প্রত্যেক জাতির (সম্প্রদায়ের) বন্ধুত্ব তাদের সমমানদের সাথে, আর যারা তাদের সমমনা নয় তাদের সাথে রয়েছে শত্রুতা। এরূপ অবস্থাই রয়েছে পার্থিব ও প্রবৃত্তির অভ্যাসের বিষয়গুলোতেও ঐসব অসৎ লোকগণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পছন্দ করে থাকে ও অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে তাদেরকেই যারা তাদের কুকর্মকাণ্ড ও প্রবৃত্তির চাহিদায় অংশগ্রহণ করবে। হয়তঃ ঐ বিষয়ে তাদেরকে সহযোগিতা করবে, যেমনটি হয়ে থাকে রাজ-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হর্তা-কর্তাগণ ও ডাকাত-ছিনতাইকারী বা অনুরূপদের বেলায়। অথবা একাত্মতার মাধ্যমে আস্বাদন গ্রহণের নিমিত্ত।

যেমন– মদপানের জন্য জমায়েত হওয়া লোকদের বেলায় প্রযোজ্য আর তারা এটাই পছন্দ করবে যে, তাদের নিকটে যারা উপস্থিত হয়েছে তারা সকলেই যেন মদপান করে। হয়তো তার একাকী শালীনতা তথা ভাল থাকাটি তাদের নিকট ঘৃণার কারণে, সেটা তার হিংসার জন্য, অথবা সে একা ভাল থাকা ব্যক্তি যেন সমাজে তাদের চাইতে উচ্চ স্থান পেতে না পারে সেজন্য এবং তাদেরকে বাদ দিয়ে লোকেরা যে তারই প্রশংসা করবে অথবা ঐ একাকী ভাল থাকা ব্যক্তির যেন তাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাবার মত কোন যুক্তি প্রমাণ আর না থাকে অথবা সে নিজে তাদেরকে কোন শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারবে এ ভয়ে, অথবা সে ঐ বিষয়টি কারও কাছে তুলে ধরলে সে তাদেরকে শাস্তি দিবে এ ভয়ে, অথবা তারা এ ভাল থাকা লোকটির অনুগ্রহের পাত্র না হয়ে বা তার ভয়ের নীচে তাদের থাকতে না

হয় এরূপ অন্যবিধ আরও কারণে তারা সকলেই তাকে এ পথে চলার সাথী করতে চায়। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ﴾

"কিতাবীদের মধ্য হতে অনেকেই একান্ত মনে চায় তোমাদের ঈমান আনার পর আবার তোমাদেরকে কাফির করে ফেলে, শুধু তাদের অন্তর্নিহিত হিংসার দরুন, তাদের নিকট সত্য উদ্ভাসিত হবার পর।"
(সূরা আল-বাকারাহ্ ২ : ১০৯)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেছেন :

﴿وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً﴾

"তারা এ আশা করে যে, যেমন তারা কাফির তদ্রূপ তোমরাও কাফির হয়ে যাও, যাতে তারা ও তোমরা একরূপ সমান হয়ে যাও।"
(সূরা আন্-নিসা ৪ : ৮৯)

'উসমান বিন 'আফ্ফান (রাযি.) বলেছেন :

ودّت الزانية لو زنى النساء كلهن.

"ব্যভিচারিণী একান্ত মনে চায়, হায়, স্ত্রীলোক সকলেই যদি ব্যভিচার করত!"

অংশগ্রহণ : তারা অংশগ্রহণ স্থির করে যেন একই পাপকার্য হয়, যেমন মদপানে অংশগ্রহণ, মিথ্যা বলা, খারাপ বিশ্বাসে অংশগ্রহণ ইত্যাদি। আবার কখনও বা পছন্দ করে যে, অংশগ্রহণটি যেন খারাপ কাজের কোন এক শ্রেণীতে হয় যেমন– ব্যভিচারী, সে চায় যে, অন্য সকলেও যেন ব্যভিচার করে। আর চোর চায় যে, অন্যরাও যেন চুরিই করে কিন্তু শুধু সে

যার সাথে ব্যভিচার করেছে তাকে ছাড়া এবং যা চুরি করেছে তা সব ছাড়া যেন হয়।

আর দ্বিতীয় কারণটি হল : তারা ঐ ব্যক্তিকে তারা যে পাপ কাজে লিপ্ত আছে সে পাপ কাজে শরীক হতে আদেশ করে থাকে, যদি তাদের সাথে শরীক হয় তো ভাল, অন্যথায় তার সাথে শত্রুতা করবে এবং এমন কষ্ট দিবে যে, সেটা শক্তি প্রয়োগের স্তরে পৌঁছায় বা পৌঁছায়ও না।

অতঃপর ঐ সকল লোক তাদের অশ্লীল কাজে অন্যের যোগদান করা পছন্দ করে অথবা তাকে উক্ত খারাপ কাজ করতে আদেশ করে এবং তারা যা করতে চায় তজ্জন্য তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। এভাবে (তাকে রাজী বা বাধ্য করার পর) যখন সে তাদের সাথে শরীক হল বা তাদেরকে সহযোগিতা করল বা তাদের আনুগত্য করল তখনই তারা তাকে ত্রুটিপূর্ণ, খাটো বা নিম্নশ্রেণীর মনে করল ও তাকে হালকা জ্ঞান করল এবং ঐ অংশগ্রহণ করাটাকেই তার বিরুদ্ধে (অন্যান্য ব্যাপারে) প্রমাণ হিসেবে খাড়া করল। আর যদি সে তাদের সাথে শরীক না হত তাহলে তারা তার শত্রুতা করত ও তাকে কষ্ট দিত। আর এই তো হল অধিকাংশ ক্ষমতাশীল যালিমদের অবস্থা।

এ যা কিছু অসৎকাজের মধ্যে বিদ্যমান সেটার সমতুল্য অবস্থা বিদ্যমান রয়েছে সৎকাজে বরং সেটা হতেও প্রবল। যেমন– আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেছেন :

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ط﴾

"আর যারা মু'মিন তাদের ভালবাসা আল্লাহ্‌র সঙ্গেই সুদৃঢ় রয়েছে।"

(সূরা আল-বাকারাহ্ ২ : ১৬৫)

কেননা পুণ্যকাজের আহ্বায়ক স্বভাবতই অধিকতর শক্তিশালী। যেহেতু মানব তাতে আহ্বায়ক, সে ঈমান ও 'ইল্‌ম, সততা ও

ন্যায়পরায়ণতা এবং আমানাত আদায়ের দিকেই আহ্বান করবে। যদি সে অন্য কাউকেও তারই অনুরূপ করতে পেরে ফেলে, তাহলে সে সেটার জন্য দ্বিতীয় আরও একজন আহ্বায়ক হয়ে গেল, বিশেষ করে সে যদি তার সমতুল্য হয়ে থাকে। আর যদি প্রতিযোগিতার সাথে হয়ে থাকে তবে তো কথাই নেই। আসলে এটাই হল সুন্দর ও প্রশংসিত বিষয়।

মু'মিনদের মধ্য হতে এমন কাউকেও যদি পাওয়া যায় যিনি তার সাথে একাত্ম হবেন এবং উক্ত (ভাল) কাজের শরীকদেরকে পছন্দ করবেন এবং যদি সে সেটা না করে, তাহলে তাকে ঘৃণা করবেন। তিনি তখন তৃতীয় আর একজন আহ্বায়ক হয়ে যাবেন।

যদি তারা তাকে ঐ কাজ করতে আদেশ দেয় এবং সেটা করতে সহযোগিতা করে এবং সেটা না করার ফলে তার সাথে শত্রুতা করে এবং তাকে শাস্তি দেয় সে তখন তার জন্য চতুর্থ আহ্বায়ক হবে। তাকে এখন তার শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী এ চার প্রকার আহ্বায়ক সকলে একত্রিতভাবে অন্যকে সংশোধন করতেও আদেশ দেয়া হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেছেন :

﴿وَالْعَصْرِ ۙ ۝ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۙ ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝﴾

"যুগের কসম, নিশ্চয়ই মানুষ অত্যন্ত ক্ষতির মধ্যে রয়েছে কিন্তু যারা ঈমান আনে এবং যারা নেক কাজ করে এবং একে অন্যকে সত্যের প্রতি উপদেশ দিতে থাকে, এবং একে অন্যকে ('আমালে সুদৃঢ় থাকার জন্য) ধৈর্যের উপদেশ দিতে থাকে তারাই ক্ষতি হতে রক্ষা পাবে।"

(সূরা আল-'আসর ১০৩ : ১-৩)

ইমাম শাফি‘ঈ (রহ.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন :

لو فكر الناس كلهم فى سورة العصر لكفتهم.

“হায়, যদি সকল মানুষ (শুধু) সূরা আল-‘আস্‌রের বিষয়বস্তুর ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করত তবে সেটাই তাদের মঙ্গল বিধানে যথেষ্ট হত।” বিষয়টি আসলে তিনি যেমন বলেছেন তেমনই। কেননা আল্লাহ উক্ত সূরায় সংবাদ দিয়েছেন যে, সমস্ত মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত, শুধু যে মানুষ ব্যক্তিগতভাবে সৎ ও বিশ্বাসী এবং অন্যের সাথে (সামাজিকভাবে) সত্যের দিকে উপদেশ দানকারী, ধৈর্যের জন্য উপদেশ দানকারী (সে ক্ষতিগ্রস্ত নয়)।

বিপদে ধৈর্য ধারণ করা অপরিহার্য

যখন বিপদ ভয়াল হয়ে দাঁড়ায় তখন সেটা মু'মিন ও সৎ লোকদের জন্য উচ্চ মর্যাদা ও মহান পুরস্কার লাভের কারণ হয়ে উঠে। যেমন– নাবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল "মানুষের মধ্যে কারা সবচাইতে কঠিন বিপদের পরীক্ষা দিয়েছেন।" জওয়াবে নাবী ﷺ বলেছিলেন :

الأنبياء ثم الصّٰلحون ثم الأمثل فالأمثل ...... الخ

"সবচাইতে বেশী বিপদে পড়েছেন নাবীগণ, তারপর হলেন সালিহীন (নেক্‌কারগণ) তারপর আদর্শ লোকগণ এবং তার পরবর্তী পর্যায়ের আদর্শ ব্যক্তিগণ। এক ব্যক্তি সে পরীক্ষিত হয় তার দীনের মজবুতি অনুযায়ী। যদি সে তার দীনের ব্যাপারে শক্ত-মজবুত হয় তাহলে তার পরীক্ষার কাঠিণ্যও বর্ধিত করা হয়ে থাকে। আর যদি সে তার দীনের ক্ষেত্রে দুর্বল হয়; তাহলে তার পরীক্ষার কাঠিন্যও কমিয়ে দেয়া হয়। মু'মিনের পরীক্ষা চলবেই; শেষাবধি এমন হবে যে, সে পৃথিবীতে বিচরণ করতে থাকবে অথচ তার কোন গুনাহ্ থাকবে না। ঐ সময় সে ধৈর্যের এত প্রয়োজনবোধ করবে যে সে অপেক্ষা আর কেউই সেটার প্রতি এত প্রয়োজনবোধ করবে না। আর সেটাই হচ্ছে দীনের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের কারণ। যেমন– আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَّهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا قف وَكَانُوا بِاٰيٰتِنَا يُوقِنُونَ ۞

"তারা যে ধৈর্য ধারণ করেছে তার ফলে তাদের মধ্য হতে কতকজনকে আমরা নেতা বানিয়েছি, তারা আমাদের আদেশ মত পথ চলে থাকে এবং আমাদের আয়াত (নিদর্শন)সমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।"

(সূরা আস্-সাজদাহ্ ৪১ : ২৪)

Contents

সুতরাং আদিষ্ট সৎকাজ করতে ও নিষিদ্ধ খারাপ কাজ বাদ দিতেও ধৈর্যের প্রয়োজন।

সেটার আওতাভুক্ত হয় কষ্টে ধৈর্য ধারণ করা এবং যা (গালমন্দ) বলা হবে, এবং যেসব বিপদ-মুসীবাত আপতিত হবে তাতেও ধৈর্য ধারণ করতে হবে। প্রাচুর্যের সময় বেশি উল্লাস তথা গর্ব করা হতে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। ইত্যাদি বহু প্রকারের ধৈর্য।

যদি বান্দার কাছে এমন জিনিস না থাকে যা দ্বারা সে শান্তি অনুভব করতে, প্রাচুর্যবোধ করতে ও খাদ্য গ্রহণ করতে পারে, তাহলে সে ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না। আর তাই হল ইয়াক্বীন (সুদৃঢ় বিশ্বাস)। যেমন– ঐ হাদীসে আছে, যা আবূ বাক্র সিদ্দীক (রাযি.) নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ইরশাদ করেছেন :

أيها الناس سلوا اللّٰهَ اليقين والعافية فإنه لم يعط أحد بعد اليقين خيرا من العافية فسلوهما اللّٰه.

“হে লোক সকল! আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস ও সুস্থতা প্রার্থনা কর। কেননা কাউকেও বিশ্বাস দান করার পর সুস্থতা ছাড়া অধিকতর ভাল আর কোন কিছুই দেয়া হয়নি। অতএব তোমরা আল্লাহ্র নিকট ঐ দু'টি জিনিস চেয়ে নাও।” (ইবনে হাম্বাল : ১/৫)

মানুষের প্রতি উত্তম ব্যবহার, চাহিদার সাথে সংশ্লিষ্ট

অনুরূপভাবে ব্যক্তি যদি কাউকেও কোন সৎকাজের আদেশ দিয়ে থাকে, অথবা ঐ ব্যাপারে তার অনুমোদন পাওয়া ভাল মনে করে থাকে, অথবা কোন খারাপ কাজ হতে নিষেধ করে তখন সে ঐ মানুষটির প্রতি এমন সদাচার করার প্রয়োজন সাধন করতে পারে যেমন– কোন প্রিয় বস্তু অর্জন করবে বা অপ্রিয় বিষয় দূর করতে পারবে।

কেননা আত্মা-নাফ্সসমূহ খানিকটা মিষ্টি ব্যতীত শুধু তিক্ত জিনিসের উপর ধৈর্য ধারণ করতে পারে না। সেটা ছাড়া সম্ভবও নয়। আর এজন্যই মহান আল্লাহ আত্মাসমূহের সন্তুষ্টি বিধানের আদেশ দিয়েছেন। এমনকি "মু'আল্লাফাত-কুলূবুহুম" (যাদের অন্তরসমূহের সন্তুষ্টি বিধানকৃত)-দের জন্য সাদাকার মালসমূহের একটি বিশেষ অংশ ধার্য করেছেন এবং আল্লাহ তা'আলা বলেছেন তার নাবী ﷺ-কে–

﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ﴾

"বাহ্যিক (দৃষ্টিতে তাদের সাথে যে) আচরণ (সমীচীন মনে হয় সেটা) গ্রহণ করুন, আর ভাল কাজের আদেশ (শিক্ষা) দিতে থাকুন এবং মুর্খদের হতে একদিকে সরে থাকুন*।" (সূরা আল-আ'রাফ ৭ : ১৯৯)

---

* রাসূল ﷺ একদা জিব্‌রাঈল ('আ.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, এ আয়াতটির হাকীকাত কি? তিনি বললেন, আল্লাহ বলেন : "যে ব্যক্তি তোমার সাথে বিচ্ছেদ অবলম্বন করে, তুমি তার সাথে মিলিত হও, আর যে ব্যক্তি তোমাকে বঞ্চিত করে, তুমি তাকে দান কর, আর যে উৎপীড়ন করে, তুমি তাকে ক্ষমা কর। এটাই উচ্চ পর্যায়ের স্বভাব।" আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আমাদেরকে এ বিষয়ে হাকীকাত অনুধাবন করার তাওফীক প্রদান করুন। আমীন! (সম্পাদক)

অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেছেন–

﴿ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴾

"এবং একে অন্যকে (ঈমানের উপর) ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিয়েছে এবং একে অন্যকে (আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি) সদয় হতে উপদেশ দিয়েছে।"

(সূরা আল-বালাদ ৯০ : ১৭)

অতএব ধৈর্য ধারণ ও দয়া প্রদর্শন ছাড়া চলবে না। আর এটাই তো হল বীরত্ব ও বদান্যতা। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা কোন কোন সময় সালাত ও যাকাতকে একত্রে উল্লেখ করেন। এটাই হল সৃষ্টির প্রতি "ইহ্‌সান" সদাচার। আবার কখনও বা নামায ও ধৈর্যকে একত্রে উল্লেখ করে থাকেন।

আসলে নামায, যাকাত ও ধৈর্য– এ তিনটি ছাড়া কোন উপায় নেই। মু'মিনগণের আত্মাসমূহের কল্যাণ সাধন ও তাদের ছাড়া অন্যদেরকে সংশোধন করতে এগুলো ছাড়া মু'মিনগণের মঙ্গল প্রতিষ্ঠিত হবে না। বিশেষ করে যতবারই ফিত্‌নাহ্-ফাসাদ ও বিপদাপদ চরম আকার ধারণ করবে ততবারই এ তিনটির (সালাত, যাকাত ও ধৈর্য) প্রয়োজনও হবে সবচাইতে বেশী।

ধৈর্য ও ক্ষমার গুণ থাকা সাধারণভাবে আদম সন্তানদের সকলের জন্য প্রয়োজন। তাদের কি ধর্মীয়, কি পার্থিব, কোন কল্যাণেই ঐ দু'টি গুণ ছাড়া সাধিত হবে না। এজন্যই তাদের সকলেই বীরত্ব ও বদান্যতার জন্য প্রশংসা প্রচার করতে থাকে, এমনকি এতই সাধারণ যে, কবিগণ পর্যন্ত তাদের প্রশংসিত ব্যক্তিদের স্তুতিগানের কবিতায় তার উল্লেখ করে থাকেন। আবার এমনিভাবে তারা কৃপণতা ও কাপুরুষতার কুৎসা ও প্রচার করে থাকেন।

আর যে সকল ব্যাপারে আদম সন্তানদের মধ্য হতে জ্ঞানীগণ একমত হন, সেটা হক, তথা সত্য বৈ কিছু নয়। উদাহরণ স্বরূপ তারা একমত হয়েছেন যে, সত্য ও ন্যায়ের প্রশংসা করতে হবে এবং মিথ্যা ও যুল্‌মের কুৎসা গাইতে হবে। নাবী ﷺ-কে যখন বেদুঈনগণ প্রশ্ন করতে করতে (ভিক্ষা চাইতে চাইতে) "সামুরাহ্" নামক কণ্টকময় বৃক্ষের নিকট পর্যন্ত চলে যেতে বাধ্য করেছিল, এমনকি ঐ বৃক্ষের কাঁটা তাঁর চাদরে গেঁথে গিয়েছিল, (মনে হয় নাবী এতক্ষণ তাদের কথাই শুনছিলেন এবং জওয়াব দিচ্ছিলেন বা ভিক্ষা দিচ্ছিলেন) এবার তিনি তাদের প্রতি মুখ তুলে তাকিয়ে বললেন : যাঁর হাতে আমার প্রাণ তার শপথ, হায়, যদি আমার নিকট এ কাঁটাদার গাছের সংখ্যা পরিমাণ উট (প্রাচুর্য) থাকত, তাহলে আমি নিশ্চয়ই সেটা তোমাদের মধ্যে বণ্টন করে দিতাম। অতঃপর তোমরা আমাকে কাপুরুষও মনে করতে না, আর মিথ্যাবাদীও ভাবতে না।" (বুখারী : ১২/১১৯, কিরমানীর ব্যাখ্যায় হা: নং- ২৬২৫, বাবুশ্ শাজা আহ্‌লিল হারবি; আন্-নাসায়ী : ৬/২২৬, মিসরী ছাপা, আল-আজহার, কিতাবুল হিবাহ্, ইবনে হাম্বাল-/১৮৪, ৪/৮২, ৮৪; এবং সেখানে আছে ثم لا تجدونى بخيلا ولا كذوبًا ولا جبانًا)

কিন্তু আসলে সেটা গুণ ও উদ্দেশের প্রকার ভেদের সাথে সাথে সেটাও বিবিধ প্রকারের হয়ে থাকে। কেননা নিশ্চয়ই নিয়্যাত অনুযায়ীই কর্মসমূহের ফলাফল আর প্রত্যেকটি ব্যক্তির জন্যই সে যা নিয়্যাত করেছে তাই নিহিত রয়েছে।
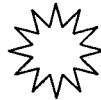
কৃপণতা ও কাপুরুষতা নিন্দনীয়

আল্লাহ্‌র কিতাব ও সুন্নাত (কুরআন ও হাদীস) কৃপণতা ও কাপুরুষতার বদনাম এবং আল্লাহ্‌র পথে বীরত্ব ও দয়ার্দ্রতার প্রশংসা নিয়ে এসেছে। অথচ যা আল্লাহ্‌র পথে নয় সেটার কথা স্বতন্ত্র। এ সম্পর্কে নাবী ﷺ বলেছেন– "ব্যক্তির মধ্যে যা খারাপ তা হল কৃপণতাময় লোভ এবং কাপুরুষতা।"– (আবূ দাঊদ : ৩/৩৬; ইবনে হাম্বাল : ২/৩০২)

তিনি আরও বলেছেন–

من سيدكم يا بني سلمة؟ فقالوا : الجد بن قيس على أنا نزنه بالبخل فقال : وأىّ داء أدوأ من البخل.

"হে বানী সালামাহ্! তোমাদের গোত্রপতি কে? তখন তারা বলল : "আল-জাদ্দু বিন কাইস, আমরা তাকে কৃপণতা দ্বারা ওজন করছি। নাবী ﷺ বললেন, কৃপণতার রোগ হতে বড় রোগ আর কি হতে পারে?"

অন্য এক বর্ণনায় আছে–

إن السيد لا يكون بخيلا بل سيدكم الأبيض الجعد البراء بن معرور.

"নিশ্চয়ই গোত্রপতি কৃপণ হতে পারে না। তোমাদের গোত্রপতি বরং শুভ্র কোকড়ানো চুল বিশিষ্ট আল-বারা বিন মা'রূর।"

অনুরূপ সহীহ্ গ্রন্থে আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রাযি.)-এর প্রতি জাবির বিন 'আবদুল্লাহ্‌র কথা এসেছে–

إمَّا أن تعطينى و إمَّا أن تبخل عني فقال : تقول : وإما ان تبخل عني؟ وأي داء أدوأ من البخل؟

"হয় আপনি আমাকে দিন, না হয় আমার সাথে কৃপণতা করুন। তখন তিনি বললেন : আপনি বলছেন "না হয় আমার সাথে কৃপণতা করুন?" কৃপণতার চেয়ে অধিকতর কঠিন রোগ আর কি হতে পারে?"– (বুখারী : ১৫/৬০-৬১, উমদাতুল কারীতে; ইবনে হাম্বাল : ৩/৩০৮)। এভাবে তিনি কৃপণতাকে সবচাইতে মারাত্মক রোগ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

সহীহ্ মুসলিমে সুলাইমান বিন রাবি'আহ হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন 'উমার (রাযি.) বলেছেন :

قسم النبى ﷺ قسما فقلت : يا رسول الله والله لغير هؤلاء أحق به منهم فقال : إنهم خيرونى بين أن يسئلوا بالفحش وبين ان يبخلونى فلست ببخيل.

"নাবী ﷺ (যাকাতের মাল) বণ্টন করেছেন, তখন আমি বললাম : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌র শপথ! এদের চাইতে অন্যরাই ঐসব মালের বেশী হকদার, তখন তিনি বললেন : তারা হয় আমার কাছে অশ্লীলভাবে চাইবে অথবা আমাকে কৃপণ বলবে। এ দু'টির যে কোন একটি গ্রহণ করতে সুযোগ দিয়েছে। কিন্তু আমি তো কৃপণ নই"– (মুসলিম : কিতাবুয্ যাকাতে; ইবনে হাম্বল : ১/২০)। তিনি বলেন যে, তারা আমার কাছে এমন চাওয়া চাইল যা সমীচীন নয়। যদি আমি তাদেরকে দিতাম (তো ভাল) ছিল আর না হয় তারা আমাকে বলত : সে বখিল (কৃপণ)। তারা তো আমাকে দু'টি অপছন্দনীয় জিনিসের যে কোন একটি বেছে নিতে বলেছে। তাদের কোন একটি গ্রহণ না করলে আমাকে ছাড়বে না অন্যায়ভাবে চাওয়া ও কৃপণ বানানো। অথচ বখিল (কৃপণ) বানানোটাই অত্যধিক কঠিন। সুতরাং আমি তাদেরকে দান করে কঠিন বিষয়টিকে প্রতিহত করলাম।

কৃপণতা এমন একটি মৌলিক বিষয় যার আওতায় বহু শ্রেণী রয়েছে : কতক কাবীরাহ্ গুনাহ্ এবং কতক কাবীরাহ্ নয়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেছেন :

﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ط بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ط سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط﴾

"আর কখনও যেন ধারণা না করে এরূপ লোক, যারা কৃপণতা করে ঐ বস্তুতে যা তাদেরকে আল্লাহ স্বীয় করুণায় দান করেছেন সেটা তাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে বরং সেটা তাদের জন্য খুবই অমঙ্গলজনক। তাদেরকে কিয়ামাতের দিন 'তাওক' পরিয়ে দেয়া হবে সেটার (ঐ মালের) যাতে তারা কৃপণতা করেছিল।" (সূরা আ-লি 'ইমরান ৩ : ১৮০)

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আরও বলেছেন :

﴿وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ لا وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا لا ۞ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ط﴾

"আর তোমরা আল্লাহ তা'আলারই 'ইবাদাত কর এবং তার সাথে কাউকেও শরীক করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথেও এবং ইয়াতীমদের সাথেও এবং দরিদ্রগণের সাথেও

Contents

এবং নিকটবর্তী প্রতিবেশীদের সাথেও এবং দূরবর্তী প্রতিবেশীদের সাথেও এবং সহচরদের সাথেও এবং তাদের সাথেও যারা তোমাদের মালিকানাধীন আছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ঐরূপ লোকদেরকে ভালবাসেন না, যারা নিজেকে বড় মনে করে ও আত্মগর্ব করে এবং অন্যকে কৃপণতা শিক্ষা দেয়।"
(সূরা আন্-নিসা ৪ : ৩৬-৩৭)

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেছেন :

﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ إِلَّآ أَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَلَا يَأْتُوْنَ الصَّلٰوةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ إِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ﴾

"আর তাদের দান-খায়রাত গ্রহণে এটা ব্যতীত আর কিছুই প্রতিবন্ধক নয় যে, তারা আল্লাহ্র সাথে ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফ্র করেছে, আর তারা নামায পড়ে না কিন্তু (পড়লেও) শৈথিল্যের সাথে, আর তারা দান করে না কিন্তু অনিচ্ছার সাথে।" (সূরা আত্-তাওবাহ্ ৯ : ৫৪)

আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন আরও বলেছেন :

﴿ فَلَمَّآ اٰتٰهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ إِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ ﴾

"কার্যত: যখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে (বহু সম্পদ) দান করলেন, তখন তারা তাতে কার্পণ্য করতে লাগল এবং (আনুগত্য হতে) পরাঙ্মুখ হতে লাগল আর তারা তো হচ্ছে মুখ ফিরিয়ে রাখাই অভ্যস্ত। অনন্তর আল্লাহ তা'আলা তাদের শাস্তিস্বরূপ তাদের অন্তরসমূহে নিফাক (উৎপন্ন) করে দিলেন, যা আল্লাহ তা'আলার নিকটে উপস্থিত হওয়ার দিনে পর্যন্ত থাকবে।" (সূরা আত্-তাওবাহ্ ৯ : ৭৬-৭৭)

আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন আরও বলেছেন ঃ

﴿وَمَنْ يَّبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ﴾

"আর যে কৃপণতা করে, বস্তুতঃ সে স্বয়ং নিজের প্রতি কৃপণতা করে।" (সূরা মুহাম্মাদ ৪৭ : ৩৮)

আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন আরও বলেছেন :

﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۙ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۙ ۝ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ع﴾

"অতএব বড় সর্বনাশ ঐ সকল নামাযীদের জন্য, যারা স্বীয় নামাযকে ভুলে থাকে, (আর যারা এরূপ যে, যখন নামায পড়ে, তখন) রিয়াকারী করে, (অর্থাৎ- লোক দেখানো নামায পড়ে) আর তারা যাকাত মোটেই দেয় না।" (সূরা আল-মা'ঊন ১০৭ : ৪-৭)

(এমনকি গৃহস্থালীতে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস খুন্তা, কাস্তে, দা-বটির মত সাধারণ জিনিসগুলোও কাউকেও দেয় না, তারা এতই কৃপণ)।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা আরও বলেছেন :

﴿وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۙ ۝ يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ط﴾

"আর যারা (অতি লোভের বশবর্তী হয়ে) স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে থাকে এবং সেটা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে না, অতএব আপনি তাদেরকে অতি যন্ত্রণাময় এক শাস্তির সংবাদ শুনিয়ে দিন, যা সেদিন ঘটবে, যেদিন

দোযখের অগ্নিতে সেগুলোকে উত্তপ্ত করা হবে, অতঃপর সেগুলো দ্বারা তাদের ললাটসমূহে এবং তাদের পার্শ্বদেশসমূহে ও তাদের পৃষ্ঠদেশসমূহের দাগ দেয়া হবে (এবং বলা হবে...")। (সূরা আত্-তাওবাহ্ ৯ : ৩৪-৩৫)

আল-কুরআনের বহু আয়াতে দান-দক্ষিণার আদেশ রয়েছে এবং যে সেটা পালন না করবে তার নিন্দায় ও অনুরূপ আয়াতসমূহ রয়েছে (আর ঐসবই কৃপণতার কুৎসা)।

অনুরূপ কাপুরুষতার নিন্দা ও তাঁর কথায় (অনেক স্থানে প্রকাশিত) :

﴿وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ط وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾

"আর সে সময়ে যে ব্যক্তি তাদের দিকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে– কিন্তু হা, যে ব্যক্তি যুদ্ধের জন্য কৌশল অবলম্বন কিংবা যে ব্যক্তি স্বদলের নিকট আশ্রয় নিতে আসে তার কথা স্বতন্ত্র, এতদ্ব্যতীত আর যে ব্যক্তি এরূপ করবে, সে আল্লাহ্র গযবে পতিত হবে এবং তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম, আর সেটা অতিশয় মন্দ আবাসস্থল।" (সূরা আল-আনফাল ৮ : ১৬)

আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ

﴿وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ ط وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ۞ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ﴾

"আর তারা আল্লাহ তা'আলা শপথ করে বলে যে, তারা (অর্থাৎ– মুনাফিকরা) তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত অথচ তারা তোমাদের কেউই নয়, বরং তারা হচ্ছে কাপুরুষের দল। যদি তারা কোন আশ্রয়স্থল পেত, অথবা গুহা

কিংবা লুকিয়ে থাকার একটু স্থান, তবে তারা অবশ্যই মুখ উঠিয়ে সেদিকে ধাবিত হত।” (সূরা আত্-তাওবাহ্ ৯ : ৫৬-৫৭)

আল্লাহ্‌র আরও বাণী আছে :

﴿فَاِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَّذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ ۙ رَاَيْتَ الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يَّنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِىِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ؕ﴾

“অতঃপর যখন কোন স্পষ্ট (বিষয়ের) সূরা নাযিল হয় এবং তাতে জিহাদেরও উল্লেখ থাকে, তখন যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তাদেরকে আপনি দেখবেন যে, তারা আপনার দিকে এমনভাবে তাকায়, যেমন কেউ মৃত্যুকালে জ্ঞানহারা অবস্থায় তাকায়।” (সূরা মুহাম্মাদ ৪৭ : ২০)

এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র আরও বাণী রয়েছে :

﴿اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْٓا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۚ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوْلَآ اَخَّرْتَنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ؕ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ ۚ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى ۗ وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا﴾

“তুমি কি তাদেরকে লক্ষ্য করনি। যাদেরকে বলা হয়েছিল যে, স্বীয় হাতসমূহকে বিরত রাখ এবং নামায কায়িম কর এবং যাকাত প্রদান করতে থাক। অনন্তর যখন তাদের প্রতি জিহাদ ফার্‌য করে দেয়া হল, তখন ঘটনা

এ দাঁড়াল যে, তাদের মধ্য হতে কেউ কেউ মানুষকে এরূপ ভয় করতে লাগল যেরূপ আল্লাহ্কে ভয় করা উচিত এবং তদপেক্ষাও অধিক এবং এরূপ বলতে রাগল, হে আমাদের রব! আপনি আমাদের উপর জিহাদ কেন ফার্‌য করে দিলেন? আপনি (হে নাবী ﷺ) বলে দিন; পার্থিব ভোগ-বিলাস কেবল কয়েক দিনের জন্য, আর পরকাল ঐ ব্যক্তির জন্য সব দিক দিয়ে উত্তম যে আল্লাহ্‌র বিরোধিতা হতে বেঁচে থাকে এবং তোমাদের প্রতি অণু-পরিমাণও যুল্‌ম করা হবে না।" (সূরা আন্‌-নিসা ৪ : ৭৭)

আল-কুরআনে জিহাদের জন্য উৎসাহ ও প্রেরণা দেয়া হয়েছে এবং জিহাদ অপছন্দকারী ও পরিহারকারীদের যত কুৎসা, তা ঐসবই কাপুরুষতার কুৎসা।

উদারতা ও বীরত্বের প্রশংসা

আর যখন আদম সন্তানদের দুনিয়ায় ও ধর্মে বীরত্ব ও বদান্যতা ব্যতিরেকে মঙ্গল সাধন হবেই না (তখন) আল্লাহ তা'আলা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন : যে ব্যক্তি নিজে জিহাদ পরিত্যাগ করার মাধ্যমে তাঁর (আল্লাহ্র) প্রতি পরাম্মুখ হবে আল্লাহ তা'আলা তার পরিবর্তে এমন এক ব্যক্তিকে আনবেন, যিনি ঐ (জিহাদের) দায়িত্ব পালন করবেন। আবার যে ব্যক্তি আপনার সম্পদ খরচ না করার মাধ্যমে আল্লাহ্র দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে, আল্লাহ্ তার পরিবর্তে এমন ব্যক্তিকে নিবেন যে ঐ সম্পদ খরচের কাজ করবে।

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেছেন :

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْـَٔاخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَـٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۝ إِلَّا تَنفِرُوا۟ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْـًٔا ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি হল? যখন তোমাদেরকে বলা হয় যে, (জিহাদের জন্য) বের হও আল্লাহ্র রাস্তায়, তখন তোমরা মাটিতে লেগে থাক (অর্থাৎ– অলসভাবে বসে থাক); তবে কি তোমরা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবনের উপর পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? বস্তুতঃ পার্থিব জীবনের ভোগ বিলাস তো আখিরাতের তুলনায় কিছুই নয়-অতি সামান্য। যদি তোমরা বের না হও, তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি

দিবেন (অর্থাৎ– ধ্বংস করে দিবেন) এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক জাতি সৃষ্টি করে দিবেন, আর তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার ধর্মের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না এবং আল্লাহ্ তা'আলা হচ্ছেন সকল বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।" (সূরা আত্-তাওবাহ্ ৯ : ৩৮-৩৯)

অন্যত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেছেন :

﴿هَآأَنتُمْ هَٰؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ج فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ ج وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ ط وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَآءُ ج وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ لا ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم ع﴾

"অবশ্য তোমরা এরূপ যে, তোমাদেরকে আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করার আহ্বান জানালে তোমাদের কেউ কেউ কৃপণতা করে, আর যে কৃপণতা করে বস্তুতঃ সে নিজের প্রতিই কৃপণতা করে আর আল্লাহ্ কারও মুখাপেক্ষী নয়; বরং তোমরা সকলে (তাঁর) মুখাপেক্ষী আর যদি তোমরা বিমুখ হয়ে থাক, তবে আল্লাহ্ তোমাদের স্থলে অপর এক সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করবেন, তারপর তারা তোমাদের মত হবে না।" (সূরা মুহাম্মাদ ৪৭ : ৩৮)

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাস্তায় বীরত্ব ও বদান্যতার বদৌলতে তাতে অগ্রগামীদেরকে মর্যাদা প্রদান করেছেন (অধিক সম্মানিত করেছেন)। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন :

﴿لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ط أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا ط وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ط﴾

"যারা বিজয়ের* পূর্বে (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় করেছেন এবং জিহাদ করেছে তারা সমান নয় (বরং) তারা ঐ সমস্ত লোক অপেক্ষা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ যারা (মাক্কাহ্ বিজয়ের) পরে ব্যয় করেছেন এবং জিহাদ করেছে আর আল্লাহ সকলকেই মঙ্গলের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন।"

(সূরা আল-হাদীদ ৫৭ : ১০)

আল্লাহ তা'আলা জান-মাল দিয়ে তাঁর পথে জিহাদ করার কথা ঘোষণা করেছেন। আর বস্তুতঃ সেটাই হচ্ছে মহান আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের ব্যাপারে বীরত্ব ও আসল বদান্যতা। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

﴿ كَمْ مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً م بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّبِرِينَ ﴾

"কত কত ক্ষুদ্র দল বৃহত্তম দলের উপর আল্লাহ্‌র হুকুমে জয়লাভ করেছে, বস্তুতঃ আল্লাহ অটল ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছে।"

(সূরা আল-বাকারাহ্ ২ : ২৪৯)

আল্লাহ্ তা'আলা আর এক স্থানে ইরশাদ করেছেন :

﴿ يٰأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوٓا اِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ج ۝ وَاَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا ط اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِينَ ج ﴾

* বিজয় বলতে মাক্কাহ্ বিজয়, সেটা অষ্টম হিজরীতে সম্পন্ন হয়।

"হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদেরকে (জিহাদে) কোন দলের সাথে সম্মুখীন হতে হয়, তখন তোমরা দৃঢ়পদ থাকবে এবং আল্লাহ্কে বেশি পরিমাণে স্মরণ করবে; আশা যে, তোমরা সফলকাম হবে আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে থাকবে এবং আপোষে বিবাদ করবে না, অন্যথায় সাহস হারা হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব বিনষ্ট হয়ে যাবে, আর ধৈর্য ধারণ করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।"

(সূরা আল-আনফাল ৮ : ৪৫-৪৬)

আসলে শরীরের শক্তিই কিন্তু বীরত্ব নয়। কেননা এমনও তো দেখা যায় যে, লোকটি শারীরিকভাবে শক্তিশালী অথচ মন তার দুর্বল। অতএব বীরত্বটা হচ্ছে মনোবল ও সেটার দৃঢ়তা। কেননা যুদ্ধ তো নির্ভর করে শারীরিক শক্তি, যুদ্ধের কলাকৌশল, সমর নৈপুণ্য এবং আত্মার বল ও সমর অভিজ্ঞতার উপর। উভয়ের মধ্যে যেটি শিক্ষা ও জ্ঞান প্রসূত হবে সেটিই প্রশংসিত। যা কোন তাড়াহুড়ায় বা চিন্তা-ভাবনা ছাড়া করা হয়নি; আবার সেটার কর্তা ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য না করেই করেছে, এমনও নয়।

আর আসলে বলিষ্ঠ শক্তিশালী সে-ই যিনি রাগের সময়ও নিজেকে সংবরণ করতে সক্ষম এবং যা করা সমীচীন নয় তা না করে, যা সমীচীন তাই করেন। অপরপক্ষে যিনি রাগের সময় নিজেকেই নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম (হয়ে যা তা করে ফেলেন), তিনি পরাভূত আসলে বীরও নয় এবং বলিষ্ঠ শক্তিশালীও নয়। ইতোপূর্বেই বলা হয়েছে, সেটার পুরোপুরি বিষয়টিই হল ধৈর্য। আর এ ধৈর্য না হলেই নয়।

আর এ ধৈর্য হল দু'রকমের : এক রকম ধৈর্য হল রাগের সময় আর এক রকমের ধৈর্য হল বিপদের সময়। যেমন– হাসান (রহ.) বলেছেন–

مايجرع عبد جرعة أعظم من جرعة حلم عند الغضب وجرعة صبر عند المصيبة.

"কোন ব্যক্তি রাগের সময় সহনশীলতার পরিচয় দেয়া এবং বিপদের সময় ধৈর্য ধারণ করা বান্দার সবচেয়ে বড় গুণ।" সেটার একমাত্র আসল হল বেদনাদায়ক বিষয়ে ধৈর্য অবলম্বন করা। আর ইনিই হলেন সুকঠিন বীর পুরুষ যিনি যন্ত্রণাদায়ক বিষয়ের উপর ধৈর্য ধারণ করেন।

ব্যথাদানকারী যদি এমন হয় যে, তাকে প্রতিহত করা সম্ভব, তাহলে রোষ সঞ্চার করে। আর যদি এমন হয় যে, তাকে প্রতিহত করা সম্ভব নয়, তবে সেটা দুশ্চিন্তার উদ্রেক করে। আর এজন্যই তাকে প্রতিহত করার মত যথেষ্ট ক্ষমতা আছে মনে হবার ফলে ধমনিতে উষ্ণ রক্ত প্রবাহ প্রবল হয় বলে মুখাবয়ব রক্তিম বর্ণ ধারণ করে। অপরপক্ষে তাকে প্রতিহত করতে অক্ষমতা অনুভূত হওয়ায় রক্ত প্রবাহ শূন্য তথা স্তিমিত হয়ে যায় বলে মুখমণ্ডল হরিদ্রা বর্ণ (ফ্যাকাসে) হয়ে পড়ে।

এজন্যই নাবী ﷺ উভয়টিকে জমা করেছেন একটি (সহীহ্) হাদীসে যা ইমাম মুসলিম সংকলন করেছেন, সেটা ইবনে মাস'ঊদ (রাযি.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, নাবী ﷺ বলেছেন :

وماتعدون الرَّقوب فيكم؟ قالوا : الرقوب الذي لا يولد له قال : ليس ذاك بالرقوب، ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا ثم قال : ماتعدّون الصُرعة فيكم؟ قلنا : الذى لا يصرعه الرجال فقال : ليس بذلك ولكن الصّرعة هوالذى يملك عند الغضب.

"তোমরা তোমাদের মধ্যে "রাকুব" বলতে কি বুঝে থাক? তাঁরা বলল : "রাকব" হল সে ব্যক্তি যার সন্তান হয় না। তিনি (ﷺ) বললেন : আসলে "রাকব" ঐ রকম নয়; কিন্তু "রাকব" হল ঐ ব্যক্তি যিনি তার

সন্তানদের মধ্য হতে কাউকেও আগে পাঠাননি। অতঃপর তিনি (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন : তোমাদের মধ্যে "সুরা'আহ" বলতে তোমরা কি বুঝে থাক? আমরা বললাম : "সুরা'আহ" বলতে এমন লোককে বুঝি যাকে বহু লোকেও ভূলুণ্ঠিত করতে পারে না। অতঃপর তিনি (ﷺ) বললেন : আসলে তা নয়। কিন্তু "সুরা'আহ" হল ঐ ব্যক্তি, যিনি রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে*।"

---

* মুসলিম : (কিতাবুল বির্) আবূ দাঊদ; আন্-নাসায়ী; ইবনে হাম্বাল ১/২৮২-এ উদ্ধৃত হয়েছে। শ্রদ্ধেয় পাঠক-পাঠিকাগণের সুবিধার জন্য এ হাদীস খানার ব্যাখ্যায় আল্লামা নাবাবী (রাহ্:) যা বলেছেন তা হুবহু তুলে ধরলাম :

ومعنى الحديث : أنكم تعتقدون أن الرقوب الحزون وهو المصاب بموت أولاده، وليس هو كذلك شرعًا بل هومن لم يمت أحد من أولاده فى حياته فيحتسبه، يكتب له ثواب مصيبته به وثواب صبره عليه، ويكون له فرطا وسلفا، وكذلك تعتقدون أن الصرعة الممدوح القوي الفاضل هو القوى الذى لا يصرعه الرجال، بل يصرعهم، ليس هو كذلك شرعًا، بل هومن يملك نفسه عند الغضب، فهذا هو الفاضل الممدوح الذي قلّ من يقدرعلى التخلق تجلقه، ومشاركته فى نضيلته بخلاف الأول : وفي الحديث فضل موت الأولاد والصبر عليهم ويتضمن الدلالة لمذهب من يقول بتفضيل التزوج وهو مذهب أبى حنيفة رحمه الله وبعض أصحابنا ١٢ انظر فى صحيح مسلم المجلد : ٥، الضفحة : ٤٦٨، كتاب البر والصلة والاٰداب بشرح النووى، رقم الحديث ١٠٣ طبع الشعب، مصرالقاهرة؛

(আল্লামা নাবাবী উক্ত হাদীসটির যে ব্যাখ্যা করেছেন তার বঙ্গানুবাদ : "তোমরা হয়তো মনে করছে যে, "রাকব" হল "চিন্তিত", যিনি তার সন্তানদের শোকে আক্রান্ত। পারিভাষিক (শারী'আতের) অর্থে সেটা ঐরূপ নয়, বরং "রাকব" হল ঐ ব্যক্তি যার জীবদ্দশায় কোন সন্তানেরই মৃত্যু হয়নি যে, তাতে সাওয়াবের আশায় ধৈর্য ধারণ করবে,

উক্ত হাদীসটিতে এমন বিষয়ের উল্লেখ করেছেন, যা বিপদ ও রাগের সময় ধৈর্যাবলম্বন করাকে সন্নিবেশিত করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বিপদের সময় ধৈর্য ধারণ সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন :

﴿وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ۙ ۝ الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ۭ﴾

"আর সুসংবাদ শুনিয়ে দিন এমন ধৈর্যশীলদেরকে যখন তাদের উপর মুসীবাত আসে, তখন বলে, আমরা তো আল্লাহ্রই আয়ত্তে, আর আমরা সকলে আল্লাহ্রই সমীপে প্রত্যাবর্তনকারী।"

(সূরা আল-বাকারাহ্ ২ : ১৫৫-১৫৬)

আল্লাহ তা'আলা রাগের সময় ধৈর্য ধারণ করা সম্পর্কে বলেছেন :

﴿وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ۚ وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ﴾

এবং তার জন্য ঐ বিপদের কারণে ধৈর্য ধারণের ফলে সাওয়াব লেখা হবে এবং ঐ সন্তান তার জন্য অধিক সাওয়াবের কারণ হবে এবং তার পূর্ব-প্রস্থানকারী গণ্য হবে। অনুরূপই তোমরা হয়তঃ মনে করছে যে, "সুরা'আহ" ঐ প্রশংসিত শক্তিশালী সম্মানিত ব্যক্তি যাকে একাধিক (বহু) লোকেও ধরাশায়ী করতে পারে না, বরং সে তাদেরকে ধরাশায়ী করতে পারে। কিন্তু আসলে পরিভাষা (শারী'আত)-এর দিক হতে সেটা ঐরূপ নয়, বরং "সুরা'আহ" হল এমন ব্যক্তি যিনি রাগের সময় নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে সক্ষম। আর ইনিই হলেন প্রশংসিত সম্মানিত যার চরিত্রে চরিত্র গঠন করতে অতি বিরল লোকই সক্ষম হয়েছে এবং তার মর্যাদায় শরীক হতে পেরেছে। ইনি হলেন ঐ প্রথম ব্যক্তির (যাকে অনেক লোকেও ধরাশায়ী করতে পারে না বিপরীত। এ হাদীসে সন্তানদের মৃত্যু ও তাতে ধৈর্য ধারণের ফাযীলাত বর্ণিত হয়েছে এবং যারা বিবাহ করাকে উত্তম মনে করেন যেমন– ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এবং শাফিঈ মাযহাবের অনেক 'উলামা, তাদের মাযহাবের পক্ষে দলীল হিসেবে প্রতীয়মান হয়।

"–সহীহ মুসলিম কিতাবুল বিররি ওয়াস্সিলাহ ওয়াল আদাব" দ্রষ্টব্য।

"যারা ধৈর্য ধারণ করেছে তারা ব্যতীত আর কেউই সেটা প্রত্যক্ষ করবে না, আর মহা ভাগ্যবান ছাড়া আর কেউই সেটা দেখতে পাবে না।"

(সূরা আল-ফুস্সিলাত ৪১ : ৩৫)

এ বিপদে ধৈর্য অবলম্বন এবং রাগে ধৈর্য অবলম্বনকে একত্র উল্লেখ করার অনুরূপ হল, বিপদে ধৈর্য অবলম্বন করা এবং প্রাচুর্যের সময় ধৈর্য ধারণ করাকে পাশাপাশি দেখানো।

যেমন আল্লাহ তা'আলার ভাষণে আছে :

﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّاتُ عَنِّي ط إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ لا ۞ إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ ط أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾

"আর যদি তাকে কোন নি'আমাত আস্বাদন করাই কোন কষ্টের পর, যা তার উপর আপতিত হয়, তখন বলতে আরম্ভ করে যে, আমার সকল দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে গেল; (আর) সে গর্ব করতে থাকে, আত্মপ্রশংসা করতে থাকে কিন্তু যারা ধীর স্বভাব এবং নেক কাজ করে তারা এরূপ হয় না; এমন লোকদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং বিরাট কর্মফল।"

(সূরা হূদ ১১ : ১০-১১)

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আরও বলেছেন :

﴿لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَكُمْ ط﴾

"যা তোমাদের হস্তচ্যুত হয় তাতে যেন তোমরা দুঃখিত না হও, আর যা তোমাদেরকে দান করেছেন তাতে যেন তোমরা গর্বিত না হও; আর আল্লাহ কোন অহংকারী, গর্বিত লোককে পছন্দ করেন না।"

(সূরা আল-হাদীদ ৫৭ : ২৩)

Contents

আর কা'ব বিন জুহাইর মুহাজির সাহাবাগণের কারও গুণাগুণ বর্ণনা করেছেন এভাবেই যেমন বলেছেন :

لا يفرحون إذا نالت سيوفهم؛ قوما وليسو المجازيعا إذانيلوا.

"তাদের অসী সমূহ কোন সম্প্রদায়ের উপর আঘাত করে জর্জরিত করে ও পরাভূত করে, তখন তারা বিজয়-গৌরবোল্লাসে ফেটে পড়ে না, আবার যখন (অন্য সম্প্রদায় কর্তৃক এরা আক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং) তাদের কাছ থেকে প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করা হয়, তখন এরা দুঃখে ও পরাজয়ের বেদনায় চিৎকার করে না।"

অনুরূপভাবে হাস্সান বিন সাবিত (রাযি.) আনসারদের গুণ বর্ণনায় বলেছেন :

لا فخر إنهم أصابوا من عدوهم؛ وإن اصيبوا فلا خور ولا هلع.

"যদি তারা শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আঘাত হানে তবুও তাদের কোন গৌরব-অহংকার নেই, আর যদি নিজেরা প্রহৃতও হয় তবুও কোন ভয় বা চিৎকার নেই।" (দিওয়ান-ই-হাস্সান বিন সাবিত, কাসিদাহ আইনিইয়্যাহ দ্রষ্টব্য; যাতে আনসারদের প্রশংসা করেছেন; মুদ্রণে : আল-হাইয়াহ মিশরিইয়াহ আম্মাহ, ২৩৭; সম্পাদনায়-হানফী হাসানাইন)

কোন আরব বেদুঈন নাবী ﷺ-এর গুণ বর্ণনায় বলেছেন :

يَغلب فلا يبطر ويُغلب فلا يضجر.

"তিনি (ﷺ) বিজয় লাভ করেও কোন গৌরব করেননি, আবার বিজিত হয়েও কোন হায়-হুতাশ করেন না।"

হা-হুতাশ ও গৌরব করা হতে নিষেধ করা

শয়তান যখন মানুষকে এ অহংকার ও হা-হুতাশের সময় তাদের অন্তরসমূহের দ্বারা, আওয়াজসমূহের দ্বারা ও হস্তসমূহ দ্বারা সীমারেখাসমূহ লঙ্ঘন করতে আহ্বান জানায় তখন নাবী ﷺ সেটা করতে নিষেধ করেছেন। নাবী ﷺ স্বীয় শিশুপুত্র ইব্রাহীমের মৃত্যু যন্ত্রণা দেখে যখন কেঁদে ফেলেছিলেন। তখন কেউ তাঁকে "আপনি কাঁদছেন অথচ আপনিই তো ক্রন্দন (বিলাপ) করতে নিষেধ করেন?" (এ কথা) বললে তিনি 'ইরশাদ করলেন : "আমি তো মাত্র দু'রকমের আওয়াজ যা বোকা ও পাপীর আওয়াজ হতে নিষেধ করেছি, (সেটা হল) :

✳ নি'আমাত লাভ হবার সময়ের (ফূর্তীর) আওয়াজ : যেমন- খেল-তামাশা, শয়তানের বাশরী (গান-বাজনার)'র আওয়াজ।

✳ বিপদ-মুসীবাতের সময়ের (দুঃখের) আওয়াজ : যেমন- বক্ষবিদারণ করে ও গাল-থাপ্ড়িয়ে এবং মূর্খ যুগের মত উপাধি বা নাম ধরে আহ্বান করে ক্রন্দন করা*। সুতরাং তিনি ঐ দু'টি আওয়াজকে পাশাপাশি মিলিয়ে উল্লেখ করেছেন।

আর বিপদের সময় যে সেটা (আওয়াজ) করতে নিষেধ করেছেন, তা যেমন- রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-

ليس منا من لطم الخدود وشقّ الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.

"যে (ক্রন্দনের সময়) গাল থাপ্ড়িয়ে কেঁদেছে এবং বক্ষ বিদারণ করেছে ও মুর্খতার যুগের ন্যায় (মৃতের) নাম বা উপাধি ধরে ডাকাডাকি করেছে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। (বুখারী : কিরমানী, ৭/৮৮, বাবু লাইসা মিন্না লাতামাল খুদূদা...; আন্-নাসায়ী এবং মুসলিমও স্ব স্ব গ্রন্থে সংকলন করেছেন)

---

* হাদীসখানা তিরমিযীতে (কিতাবুল জানায়িয) এ এসেছে। তিনি বলেছেন "হাসানুন সহীহুন্।"

নাবী ﷺ আরও বলেছেন :

أنا بريء من الحالقة والصالحة والشاقة.

"মাথা ন্যাড়াকারিণী, বিলাপকারিণী ও বক্ষবিদারিণীর সাথে আমার কোনও সম্পর্ক নেই"– (বুখারী : কিতাবুল জানায়িয, মা ইউনহা মিনাল হালকি তাল মুসীবাহ, ৭/৯৩; মুসলিম ১/৭০, কিতাবুল ঈমান; আন্-নাসায়ী : ৪/২০, বাবুস্ সালক)। আরও বলেছেন :

ما كان من العين والقلب فمن الله وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان.

অর্থাৎ "বিপদাপদে চোখে ও অন্তরে যে শোকপোষণ হবে তা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে। অপরদিকে যা হাত ও রসনা দ্বারা প্রকাশ পাবে : সেটা শয়তানের পক্ষ হতে।" নাবী ﷺ আরও বলেছেন :

إن اللّه لا يؤاخذ على دمع العين، ولا حزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা (বিপদের সময়) চোখের পানি, এবং অন্তরের বেদনার জন্য পাকড়াও করবেন না, কিন্তু এ কারণে শাস্তি দিবেন অথবা দয়া করবে– এটা বলে তিনি (ﷺ) স্বীয় জিহ্বার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।"

এ সম্পর্কে তিনি (ﷺ) আরও বলেছেন :

من ينح عليه فإنه يعذب بما ينح عليه.

"যার জন্য বিলাপ করা হয়, নিশ্চয়ই ঐ বিলাপ করার কারণে তাকে 'আযাব দেয়া হয়"– (বুখারী : ৭/৯৮, কিরমানী, কিতাবুল জানায়িয; মুসলিম : নাবাবী, ৬/২২৫-২২৬)।

নাবী ﷺ স্ত্রীলোকদের বাই'আত গ্রহণের সময় এরূপ শর্তারোপও করেছেন– "ان لا ينحن." "তারা যেন মৃতের জন্য বিলাপ করে ক্রন্দনও না করে।" এবং তিনি (ﷺ) বলেছেন :

إنّ النائحت إذا لم تتب قبل موتها فإنها تُلبس يوم القيٰمة درعا مِن جرب وسربالا من قطران.

"নিশ্চয়ই ক্রন্দসী মহিলা– যদি মৃত্যুর পূর্বেই তাওবাহ্ না করে– তবে কিয়ামাতের দিন তাকে একটি বর্ম পরানো হবে এবং আলকাতরার একটি পায়জামা পরিয়ে দেয়া হবে। প্রিয় নাবী ﷺ হত্যা করা এবং বিপদ-মুসীবাত ও আনন্দ-ফূর্তীর বেলায় আমরা কেমন করব বা করতে হবে তা 'ইরশাদ করেছেন :

إن اللّٰه كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذجتم فأحسنوا الذبحة وليحدّ أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর প্রতিই সদ্ব্যবহার করা অবধারিত করেছেন। সুতরাং যখন তোমরা কাউকেও (প্রয়োজনবোধে যেমন হত্যার বদলে) হত্যা করবে তখন তার এ হত্যা সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করবে। আর যখন তোমরা যবেহ করবে, তখন উত্তমরূপে যবেহ করবে এবং তোমাদের কেউ যেন অবশ্যই তার অস্ত্রটা তেজ-ধারালো করে নেয় এবং যবেহের পশুকে আরাম প্রদান করে।"

(আবূ দাঊদ : ৩/২৪৪, কিতাবুল আদাহী বাবুন্নাহয়ী আন তাসারুরিল বাহায়েম; আত্-তিরমিযী : ৪/২২, হা: নং– ১৪০৯, বাবু ফি আল-নাহ্য়ী 'আনিল মুসলাহ, আল-নাসায়ী : ৭/২২৭০, বাবুল আমরি বি এহদাদিশ শাফ্রাতে; ইবনে মাযাহ্ : ২/১০৫৮, হা: নং– ৩১৭০; আদ্-দারমী : ২/৮২, বাবুন ফি হুসনিয যাবিহাহ; ইবনে হাম্বাল : ৪/১২৩, ২৪, ২৫)

Contents

তিনি (ﷺ) আরও বলেছেন :

إنّ أعف الناس قتلة أهل الإيمان.

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই ঈমানদারগণই হত্যার বিষয়ে অধিক দয়াপ্রবণ (ক্ষমাশীল)।" (আবূ দাউদ : ৩/১২০, কিতাবুল জিহাদ, বাবুন্ নাহ্য়ী 'আনিল মুসলাহ; ইবনে মাজাহ্ : ২/৮৯৪; ইবনে হাম্বাল : ১/৩৯৩)

তিনি (ﷺ) আরও বলেছেন :

لاتمثلوا ولا تعذروا ولا تقتلو وليدا.

অর্থাৎ "তোমরা কাউকে হত্যা করে প্রদর্শনীর জন্য ঝুলিয়ে রেখও না, (মৃতের নাক, কান বা অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলো না) গাদ্দারী করো না এবং নবজাত শিশুকেও হত্যা করো না।"

(আত্-তিরমিযী : ৩/১৬২, হা: নং- ১৬১৭, কিতাবুস্ সিয়ার, বাবু মা যা-য়া ফি অসিয়াতি (ﷺ) ফিল কিতাল; ইবনে মাজাহ্ : ২/৯৫৩, কিতাবুল জিহাদ, বাবু ওয়াসীয়্যাতিল ইমামি ফিস্ সারা-ইয়া-; আল-মুওয়াত্তা : পৃ: ২৯৭, কিতাবুল জিহাদ; আদ্-দারিমী : ২/২১৫, কিতাবুস্ সিয়ার, বাবু ওয়াসীয়্যাতিল ইমামে ফিস্ সিরা-ইয়া; ইবনে হাম্বাল : ১/১০০০; ৪/২৪০, ৫/৩৫৮)

সেটা ছাড়াও যুদ্ধের আরও অনেক বিষয় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যার আদেশ (শিক্ষা) দিয়েছেন, যেমন : ন্যায়পরায়ণতা, সীমালঙ্ঘন পরিহার করা। এসবই আল্লাহ তা'আলার বাণী অনুযায়ী :

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾

"এবং কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে এটার প্রতি উদ্যত না করে যে, তোমরা ন্যায়বিচার না কর। ন্যায়বিচার করো। এটা খোদাভীতির অধিকতর নিকটবর্তী।" (সূরা আল-মায়িদাহ্ ৫ : ৮)

আর আল্লাহ্র এ কথার পরিপ্রেক্ষিতেও

﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾

"আর তোমরা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ কর তাদের সঙ্গে, যারা (চুক্তি ভঙ্গ করে) তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় আর তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়, আল্লাহ তা'আলা সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।"
(সূরা আল-বাকারাহ্ ২ : ১৯০)

এবং তিনি রেশমের তৈরী পোশাক পরিধান করতে, স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করতে, স্বর্ণ রৌপ্যের থালা-বাসনে পানাহার করতে এবং অতিরিক্ত লম্বা করে কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। এটা ছাড়া অন্যবিধ বহু ধরনের অপচয় এবং নি'আমাতের অহঙ্কার করতে নিষেধ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ সকল লোকদের নিন্দা করেছেন যারা রেশমের বুনানো কাপড়, অবৈধভাবে নারী ব্যবহার, রেশমী কাপড় পরিধান, মদপান ও গীত বাদ্যযন্ত্রসমূহের ব্যবহার হালাল মনে করবে এবং যারা এসব করবে তাদের জন্য মাটিতে চূর্ণ-বিচূর্ণ ও চেহারা পরিবর্তনের মত ভয়ঙ্কর শাস্তির কথা বলেছেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা তো বলেছেনই :

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ এরূপ লোকদেরকে ভালবাসেন না যারা নিজেকে বড় মনে করে ও আত্মগর্ব করে।" (সূরা আন্-নিসা ৪ : ৩৬)

আল্লাহ তা'আলা 'কারূন' সম্পর্কে বলেছেন :

﴿ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴾

"যখন তার সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে বলেছিল, তুমি গর্ব করো না, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা গর্বকারীদেরকে পছন্দ করেন না।"

(সূরা আল-ক্বাসাস ২৮ : ৭৬)

আর এ তিনটি বিষয়-মনস্কামনায় সীমালঙ্ঘন করা হতে ধৈর্য ধারণ হল– এ অধ্যায়ের মূল কথা। আর সেটা হল যে, নিশ্চয়ই মানুষ, (জীবন-যাপন করে) যা সে ভালবাসে ও কামনা করে তা, ও যা সে ঘৃণা করে ও অপছন্দ করে তা (এ দু')র মধ্যবর্তী।

সুতরাং তার ঐ প্রথমটির প্রতি ভালবাসা ও মনস্কামনা থাকার কারণে সে সেটা পেতে চায়, আবার ঐ দ্বিতীয়টির প্রতি তার ঘৃণা ও অনীহা থাকার কারণে সে সেটা দূরে ঠেলে দেয়। এখন যদি তার ঐ প্রথমটি অর্জিত হয়ে যায় এবং দ্বিতীয়টি দূর হয়ে যায়, তাহলে সেটা তাকে খুশী ও আনন্দ প্রকাশ করতে বাধ্য করে। আর যদি দ্বিতীয়টিই অর্জিত হয়ে যায় এবং প্রথমটি বিদূরিত হয়ে পড়ে, তখনই তার দুঃখ হয়। অতএব ভালবাসা ও মনস্কামনা (চরিতার্থ হবার) সময় তাদের সীমালঙ্ঘন হতে তার ধৈর্য ধারণ করা উচিত। তদানুরূপ তার রাগ ও অপছন্দের সময়ও তাদের সীমালঙ্ঘন হতে ধৈর্য ধারণ (করে বিরত থাকা) উচিত। আর আনন্দ-উল্লাসের সময় সেটার বিপদের সময়ও তার কারণে অধৈর্য হওয়া হতে ধৈর্য অবলম্বন করতে হবে।

নাবী ﷺ তো পাপ পূর্ণ ও বোকামীভরা দু'টি আওয়াজেরই উল্লেখ করেছেন। (প্রথমতঃ) ঐ আওয়াজ যা আনন্দের সময় সীমালঙ্ঘনে বাধ্য করে, এমন কি মানুষ তখন খুশীভরে অহংকারী হয়ে বসে। (দ্বিতীয়তঃ) ঐ আওয়াজ যা দুঃখের সময় তাকে অধৈর্য করে তোলে। এমনকি মানুষ তখন ভীত বিহ্বল ও ধৈর্যহীন হয়ে পড়ে। তবে হ্যাঁ, যে সকল আওয়াজ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য রোষ সঞ্চার করে। যেমন ঐ সকল আওয়াজসমূহ, যেমন যুদ্ধের সময় যে সকল কবিতাসমূহ আবৃত্তি করা হয়। আর ঐগুলোতে তো

বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয় না। অনুরূপভাবে আনন্দ (বৈধ) ফূর্তীর সময় সেটা প্রচারের আওয়াজসমূহ। এ সকল বিষয়ের যেগুলো সম্পর্কে নাবী ﷺ-এর কথা, কাজ, অনুমোদন (স্বীকৃতি) বা নাবী ﷺ-এর সামনে সেটা করাতে তিনি (ﷺ) চুপ রয়েছেন (নিষেধ করেননি) তথা নাবীর সুন্নাতে পাওয়া গেছে ঐগুলো বৈধ করেছেন। যেমন : বিবাহ্-শাদীতে ও খুশী-উৎসবে মেয়েলোক ও শিশু-কিশোরদের "দফ" বাজানো এবং সাধারণভাবে ঐ সকল কবিতাসমূহ যা অন্তরসমূহে আন্দোলন সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করা হয়ে থাকে, ঐগুলো এগুলো সাধারণতঃ এ চার প্রকারের আওতাভুক্ত।

যথা– গযল জাতীয় কবিতা এবং রোষ উদ্রেককারী ও উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কবিতাসমূহ। আর সেটাই হচ্ছে বীরগাঁথা, কুৎসাগীতি এবং বিপদাপদে আবৃত্তি কবিতাসমূহ। যেমন– মর্সিয়া এবং প্রাচুর্য ও আনন্দের কবিতাসমূহ আর ওগুলোই হল প্রশংসাগীতিসমূহ।

আর কবিদের তো এ রকম অভ্যাস হয়ে গেছে যে, তারা স্বভাবের সাথে চলে। উদাহরণ স্বরূপ, যেমন– আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ۞ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ ﴾

"তুমি কি অবগত নও যে, তারা প্রত্যেক ময়দানে হতবুদ্ধি হয়ে ঘুরতে থাকে এবং মুখে এমন বাক্যসমূহ উচ্চারণ করতে থাকে– যা তারা প্রকৃতপক্ষে করে না।" (সূরা আশ্-শু'আরা ২৬ : ২২৫-২২৬)

আর এজন্যই (কবিদের সম্পর্কে) আল্লাহ বলেছেন : "কবিদের পথে তো পথভ্রষ্ট লোকেরাই চলে থাকে।" "আল্ গা-ওয়ি" হল ঐ ব্যক্তি যে অজান্তে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আর ঠিক এটাই পথভ্রষ্টতা। যা

পথপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিপরীত। যেমন– সৎ পথচ্যুত সে ব্যক্তি যে নিজের মঙ্গলামঙ্গল জ্ঞাত নয়; যে সুপথের যাত্রীর বিপরীত। এ সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন সুষ্ঠুভাবে বলেছেন :

﴿وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى ۙ ۝ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ۚ﴾

"নক্ষত্রের কসম যখন সেটা অস্ত যেতে থাকে। তোমাদের সঙ্গে অবস্থানকারী (এ রাসূল) পথভ্রষ্টও হননি এবং বিপথগামীও হননি।"

(সূরা আন্-নাজ্‌ম ৫৩ : ১-২)

এজন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

عليكم بسنتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى.

"তোমরা আমার আদর্শকে মজবুত করে ধরবে এবং আমার (তিরোধানের) পর সৎপথের দিশাপ্রাপ্ত খুলাফা-ই-রাশিদীনের আদর্শ আঁকড়িয়ে ধরবে।"

(আবূ দাঊদ : ৫/১৩, কিতাবুস্ সুন্নাহ্, বাবু ফি লুজুমিস্ সুন্নাহ্; আন্-নাসায়ী : ৫/১৪, হা: নং- ২৬৭৬, কিতাবুল 'ইল্ম, বাবু মা-যায়া ফিল আখজি বিস্‌সুন্নাহ্; ইবনে মাজাহ্ : ১/১৫, মুকাদ্দিমাহ্; ইবনে হাম্বাল : ৪/১২৬-১২৭)

সুতরাং হে পাঠক! তুমি দেখতে পাবে যে, তারা বীরত্ব বলতেই সেটার প্রশংসা করছেন এবং দয়া বলতেই সেটারও প্রশংসা করছেন। আর যদি এ উভয়েরই অভাব থাকে (কারও মধ্যে), তবে তো সে হবে তিরস্কৃত। আর উভয়ের উপস্থিতিতে সাধারণভাবে অন্তরসমূহের পরিপূরক রয়েছে।

কিন্তু সেটার (শেষ) শুভ পরিণাম মুত্তাকীগণের জন্যই, আর সেটা তাদের জন্য পৃথিবীতে, শুধু আখিরাতেই নয়। ঐ শুভ পরিণাম যদি আখিরাতে থেকেই থাকে, তাহলে দুনিয়াতেও থাকবে।

যেমন– আল্লাহ তা'আলা নূহ্ ('আ.) ও নৌকায় সাহায্যে তার মুক্তি পাবার ঘটনা উল্লেখ করতে যেয়ে বলেছেন :

﴿قِيلَ يٰنُوحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰى أُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ ط وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ تِلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكَ ج مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَآ أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا ط فَاصْبِرْ ط إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ع﴾

"বলা হল যে, হে নূহ্! অবতরণ কর আমার পক্ষ হতে সালাম ও বারাকাতসমূহ নিয়ে যা তোমার উপর নাযিল হবে এবং সে দলসমূহের উপর যারা তোমার সঙ্গে রয়েছে আর অনেক দল এরূপও হবে, যাদেরকে আমি কিছুকাল (দুনিয়ার) সুখ-সাচ্ছন্দ্য দান করব, তারপর তাদের উপর পতিত হবে আমার পক্ষ হতে কঠোর শাস্তি। সেটা গায়িবী সংবাদসমূহের অন্তর্গত, যা ওয়াহী মারফত আপনাকে পৌঁছাচ্ছে, ইতোপূর্বে সেটা না আপনি জানতেন, আর না আপনার কওম; অতএব ধৈর্য ধরুন; নিশ্চয়ই শুভ-পরিণাম মুত্তাকীদের জন্যই।" (সূরা হূদ ১১ : ৪৮-৪৯)

অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেছেন :

﴿فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ص فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوٓا أَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾

"সুতরাং যে ব্যক্তি তোমাদের উৎপীড়ন করে তোমরাও তার প্রতি উৎপীড়ন করবে, যেরূপ সে তোমাদের প্রতি উৎপীড়ন করেছে। আর আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক এবং বিশ্বাস রাখ যে, আল্লাহ্ মুত্তাকীর সঙ্গে থাকেন।" (সূরা আল-বাকারাহ্ ২ : ১৯৪)

বীরত্ব ও উত্তেজনা যা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য হবে, সেটাই প্রশংসিত

এ ব্যাপারে সবিশেষ কথা হল যে, বীরত্ব ও উত্তেজনা, যেটুকুর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ প্রশংসা করেছেন ততটুকুরই প্রশংসাই হলো সুন্দর এবং তার নিন্দাই হলো অসুন্দর, তিনি ছাড়া, অন্য কোনও কবিগণ বা বক্তা-বাগ্মীদের বেলায় তা নয়। সুতরাং যখন বানী তামীমের কোন এক ব্যক্তি নাবী ﷺ-কে বলেছিল :

إن حمدي زين و ذمي شين،

"নিশ্চয়ই আমার প্রশংসাই সুন্দর, আর আমার কুৎসাই সুন্দর, আর আমার কুৎসাই অসুন্দর।" তখন এটার পরিপ্রেক্ষিতে নাবী ﷺ তাকে বলে ছিলেন : ذاك اللّٰه

"(এ রকমের অধিকারী তুমি নও; বরং সেটার অধিকারী) সে তো আল্লাহ।" (তিরমিযী : কিতাবুত্ তাফসীর; ইবনে হাম্বাল : ৩/৪৮৮-এ এসেছে)

আল্লাহ তা'আলা একমাত্র তাঁরই রাস্তায় বীরত্ব ও উত্তেজনার প্রশংসা করেছেন। যেমন– সহীহ্ হাদীস গ্রন্থে আবূ মূসা আশ'আরী (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন :

قيل لرسول اللّٰه ﷺ الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأىّ ذٰلك فى سبيل اللّٰه؟ فقال : من قاتل لتكون كلمة اللّٰه هى العليا فهو فى سبيل اللّٰه.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসিত হলেন : এক ব্যক্তি বীরত্বের কারণে যুদ্ধ করে, আবার একজন উত্তেজনার বশে যুদ্ধ করে, আবার একজন লোক

দেখাবার জন্য যুদ্ধ করে, এখন ঐগুলোর কোন্টি আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধ হবে? তিনি বললেন– "আল্লাহ্র কালিমাই সর্বোচ্চ হোক" এজন্য যে যুদ্ধ করবে, তা হবে আল্লাহ্র রাস্তায়।"

(বুখারী : কিতাবুল 'ইল্ম; মুসলিম : ২/৪৮, কিতাবুল জিহাদ; আবূ দাঊদ : ৩/৩১, হা: নং– ২৫১৭, কিতাবুল জিহাদ; নাসায়ী : ৬/২৩, ঐ; ইবনে মাজাহ্ : ২/৯৩১, হা: নং– ২৭৮৩, ঐ; ইবনে হাম্বাল : ৪/৩৯৭, ৪০২)

আল্লাহ তা'আলা তো ঘোষণাই করেছেন :

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ ج﴾

"আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সে পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাক, যে পর্যন্ত না তাদের হতে ফিত্নাহ্ (শির্ক) বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং (তাদের) ধর্ম (কেবল) আল্লাহ্ তা'আলারই হয়ে যায়।" (সূরা আল-আনফাল ৮ : ৩৯)

আর সেটা এজন্যই : যেহেতু সেটাই একমাত্র উদ্দেশ্য যেজন্য আল্লাহ তা'আলা তার সমস্ত জীবকে সৃষ্টি করেছেন। যেমন– আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং ঘোষণা করেছেন :

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ﴾

"আর আমি জিন ও মানুষকে এজন্য সৃষ্টি করেছি, যেন তারা আমারই 'ইবাদাত করে।" (সূরা আয্ যা-রি'আত ৫১ : ৫৬)

সুতরাং যা কিছু মূল উদ্দেশের জন্য হবে, যে জন্য সমস্ত মাখ্লুক সৃষ্টি হয়েছে, সেটাই আল্লাহ্র নিকট প্রশংসিত হবে। আর সেটাই (বান্দা যা আল্লাহ্র জন্য করবে) বান্দার জন্য স্থায়ী থাকবে এবং তাকে আল্লাহ তা'আলা সেটা দ্বারা উপকৃত করবে। আর এগুলোই হল নেক 'আমালসমূহ। এজন্যই মানুষ মূলতঃ চার শ্রেণীর :

✱ যারা বীরত্ব ও দয়ার সাথে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে থাকে। আর এরাই হলেন বিশ্বাসীগণ, যারা জান্নাতের উপযুক্ত।

✱ আর যারা আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারও সন্তুষ্টি বিধানের জন্য বীরত্ব ও দয়ার সাথে কাজ করে থাকে।

এ শ্রেণীর লোকেরা তাদের কাজকর্ম দ্বারা এ পৃথিবীতে লাভবান হবে ঠিকই, কিন্তু আখিরাতে তাদের জন্য কোন অংশই থাকবে না।

✱ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্যই কাজ করে; কিন্তু বীরত্ব বা দয়ার সাথে নয়; এরূপ কাজ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তার মধ্যে মুনাফিকী ও ঈমানে ত্রুটি রয়েছে ঐ পরিমাণে, যে পরিমাণে বীরত্ব ও দয়া না থাকবে।

✱ চতুর্থ শ্রেণী হলো : যে আল্লাহ্‌র জন্যও কাজ করে না, আবার তাতে বীরত্ব বা দয়াও থাকে না, সুতরাং এ ব্যক্তির দুনিয়াতেও কিছু নেই আখিরাতেও কিছু নেই।

এ সকল চরিত্রসমূহ ও কার্যাবলীর প্রতি মু'মিনগণই সাধারণভাবে মুখাপেক্ষী, বিশেষ করে কঠিন বিপদাপদ ও চরম ফিত্‌নার সময়। কেননা তারা তো তাদের আত্মাসমূহের মঙ্গল বিধানের প্রয়োজন মনে করে থাকে এবং তাদের কাছে যখন ফিত্‌নাহ্-ফাসাদের কথা অনুভূত হয় তখন তারা তাদের আত্মাসমূহ হতে পাপসমূহ ও মুসীবাতাসমূহ দূর করতে প্রয়োজন বোধ করে। আর তাদের শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যকে সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করারও প্রয়োজনবোধ করে। আর এ দ্বিবিধ কাজে যে জটিলতা আছে তা তো আছেই, তা যদিও অল্প হোক, তা তার জন্য যার জন্য আল্লাহ্ তাকে সহজ করে দিয়েছেন।

আর এটা যেহেতু আল্লাহ মু'মিনদেরকে ঈমান ও সৎকাজের স্বার্থে জিহাদ করতে ডাক দিতে আদেশ করেছেন। কিন্তু তারা তো যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

﴿ وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ط اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِىٌّ عَزِيْزٌ ۝ اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ﴾

"এবং নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন যে আল্লাহ্‌র (ধর্মের) সাহায্য করবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা শক্তিমান পরাক্রান্ত। যারা এমন যে, যদি নামায কায়িম করবে এবং যাকাত প্রদান করবে, আর (অপরকে) নেক কাজ করতে বলবে এবং অসৎকাজ হতে নিষেধ করবে, আর সমস্ত কাজের শুভ পরিণাম তো আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ন্ত্রণে।"

(সূরা আল-হাজ্জ ২২ : ৪০-৪১)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা আরও বলেছেন :

﴿ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ ﴾

"আমরা নিশ্চয়ই আমাদের রাসূলগণকে সাহায্য করব, আর ঐ সকল লোকদেরকেও সাহায্য করবো যারা (মূলতঃ) ঈমান আনয়ন করেছে, এ পৃথিবীর জীবনেও (সাহায্য করবো) আর যেদিন সাক্ষীগণ (আল্লাহ্‌র সমীপে) দণ্ডায়মান হবেন।" (সূরা গাফির ৪০ : ৫১)

এখানেও আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আরও বলেছেন :

﴿ كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ ط اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيْزٌ ﴾

"আল্লাহ তা'আলা এ কথা লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন যে, আমি এবং আমার রাসূলগণ জয়ী থাকব; নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমতাবান, মহাপরাক্রান্ত।" (সূরা আল-মুজাদালাহ্ ৫৮ : ২১)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা আরও বলেছেন :

﴿وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾

"আর নিশ্চয়ই আমার সেনানীরা অবশ্যই তারা বিজয়ী থাকবে।"

(সূরা আস্-সাফ্ফাত ৩৭ : ১৭৩)

যেহেতু সৎকাজের আদেশ দান এবং অসৎকাজ হতে নিষেধ করা এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করার মধ্যে পরীক্ষা এবং কষ্ট রয়েছে, যার কারণে মানুষ ফিত্‌নার সম্মুখীন হয়ে থাকে, সেহেতু মানুষের মধ্যে এমন লোক তৈরি হয়েছে যে ব্যক্তি ফিত্‌নাহ্ হতে বেঁচে থাকতে চায়, এ সুবাদে তার উপর যা ওয়াজিব হয়েছে সেটা (জিহাদ) এড়িয়ে যাবার মত বাহানা (কৈফিয়ত) তৈরি করে। উদাহরণ স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের সম্পর্কে যা বলেছে :

﴿وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي ۚ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ۗ﴾

"আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও আছে, যে বলে, আমাকে (যুদ্ধে গমন না করার) অনুমতি দিন এবং আমাকে বিপদে ফেলবেন না; ভালরূপে বুঝে নাও যে, তারা তো বিপদে পড়েই গেছে।"

(সূরা আত্-তাওবাহ্ ৯ : ৪৯)

মুফাস্‌সিরগণ তাফসীরে উল্লেখ করেছেন :

এ আয়াতখানি আল-জাদ্দ বিন কায়েসকে উপলক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে, যখন নাবী ﷺ তাকে রোমানদের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলেছিলেন এবং মনে হয় (ইবনে তাইমিয়াহ্ বলেন :) নাবী ﷺ তাকে বলেছিলেন :

هل لك في نساء بنى الأصفر؟ فقال : يا رسول الله إني رجل لا أصبر على النساء وإني أخاف الفتنة بنساء بني الأصفر فأذن لِي ولا تفتني.

"ওহো! হলদে রং লোকদের স্ত্রীগণের প্রতি তোমার কোন আগ্রহ আছে কি? তখন সে বলল : হে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ! আমি এমন একজন মানুষ যে, স্ত্রীদের ব্যাপারে আমি ধৈর্য ধারণ করতে পারি না আর এজন্যই আমি ঐসব হলদে রং লোকদের স্ত্রীগণ কর্তৃক ফিত্‌নার আশংকা করছি। অতএব আমাকে (যুদ্ধে গমন না করার) অনুমতি দিন এবং আমাকে বিপদে ফেলবেন না।" (মুসলিম : ২/২৭৫, কিতাবুল মুনাফিকীন; তিরমিযী : ৫/৬৯৬, কিতাবুল মানাক্বিব, হা: নং- ৩৮৬৩; বাবু ফি ফাদলি মান বা-ইয়া তাহ্‌তাশ শাজারাহ্)

উপরোল্লিখিত 'আল-জাদ্দ' সে ব্যক্তি যে ব্যক্তি হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়কালের "বাই'আত-ই-রিযওয়ান"–যা একটি গাছের নীচে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখান হতে (অংশগ্রহণ না করে বরং) গা-ঢাকা দিয়ে পিছিয়েছিল এবং লাল রং এর একটি উটের আড়ালে লুকিয়েছিল। তার সম্পর্কে একটি হাদীস এসেছে; নাবী ﷺ বলেছেন :

إن كلّهم مغفور له إلاّ صَاحب الجمل الأحمر.

"নিশ্চয়ই তাদের (ঐ বাই'আত-ই-রিযওয়ানের সফরে অংশ গ্রহণকারী) সকলেই ক্ষমাপ্রাপ্ত; শুধু সে লাল উটের আড়ালে লুকানো লোকটি ব্যতীত"।*

---

* হাদীসখানা মুসলিম ২/২৭৫ (কিতাবুল মুনাফিকীন) তিরমিযী ৫/৬৯৬ (কিতাবুল মানাকিব) হাদীস নং- ৩৮৬৩; বাবু ফী ফায্‌লি মান বা-ইয়া তাহ্‌তাশ শাজারাহ দ্রষ্টব্য।

অতঃপর আল্লাহ তার সম্পর্কে অবতীর্ণ করলেন :

﴿ مِنْهُم مَّن يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ﴾

"আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও আছে যে বলে, আমাকে (যুদ্ধে গমন না করার) অনুমতি দিন এবং আমাকে বিপদে ফেলবেন না, ভালরূপে বুঝে নাও যে, তারা তো বিপদে পড়েই গেছে।" (সূরা তাওবাহ্ ৯ : ৪৯)

ব্যাখ্যাকার বলেন : সে স্ত্রীলোকের ফিত্নাহ্ হতে বাঁচার জন্য রোমের যুদ্ধে যাওয়া হতে অব্যাহতি চেয়েছিল যাতে তাকে বিপদে ফেলা না হয়। এজন্য হারাম হতে দূরে থাকার (এড়িয়ে চলার) প্রয়োজন এবং স্বীয় নাফ্সের বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম করা দরকার ছিল। এতে সে অন্তরে যারপর নেই কষ্ট পাবে, অথবা ঐ বিপদে পতিত হলে তজ্জন্য সে গুনাহ্গার হবে। কেননা নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি সুন্দর চেহারাসমূহ (ছবি) দেখতে পেয়ে পছন্দ করে ভালবেসে ফেলে। অতঃপর যদি সেটা উপভোগ করতে না পারে হয়ত বা আল্লাহ্র পক্ষ হতে হারাম হবার কারণে, অথবা সেটা লাভ করতে নিজের অক্ষমতার ফলে– এমতাবস্থায় সে (অবশ্যই) নিজের আত্মাকেই শাস্তি দিবে। আর যদি সেটা উপভোগ করতে সমর্থ হয়ে হারাম কাজ করে ফেলে তবে তো সে ধ্বংসই হয়ে গেল। অথচ হালালভাবেও ঐ বিষয়ে স্ত্রী গ্রহণের মাঝেও অনেক ঝুঁকি বা পরীক্ষা রয়েছে।

আর তার "আমাকে বিপদে ফেলবেন না" বলার এটাই ছিল মূল কারণ। এ সুবাদে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

﴿ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ط ﴾

"ভাল করে বুঝে নাও, তারা তো বিপদে পড়েই গেছে।"

(সূরা তাওবাহ্ ৯ : ৪৯)

ব্যাখ্যাকার বলছেন : জিহাদে গমনের মত একটি অপরিহার্য কাজ

হতে সরে থাকাটা এবং তার সেটা হতে পিছিয়ে থাকাও ঈমানের দুর্বলতা এবং তার অন্তরের ঐ ব্যাধি যা তার সামনে যুদ্ধ পরিহার করাকে সুন্দর করে দেখিয়েছে, সেটাই সবচাইতে বড় ফিত্‌নাহ্ যাতে সে ইতোমধ্যেই পতিত হয়েছে।

কোন্ বিবেকে সে বড় বিপদের মাঝে পতিত হবার মাধ্যমে (যা ইতোমধ্যেই তাকে পেয়ে বসেছে) সে ছোট্ট বিপদ (যা তাকে এখনও পায়নি) হতে নিষ্কৃতি অনুসন্ধান করছে? অথচ আল্লাহ তা'আলা আদেশ করছেন :

﴿وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ط﴾

"এবং তাদের সঙ্গে ঐ পর্যন্ত যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত না তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের অবসান হয় এবং (তাদের) ধর্ম খাঁটিভাবেই আল্লাহ্‌রই হয়ে যায়।" (সূরা আল-বাকারাহ্ ২ : ১৯৩)

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ হতে নিষেধের ক্ষেত্রে মানুষের শ্রেণীসমূহ

আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং যে যুদ্ধের আদেশ দিয়েছেন, ঐ যুদ্ধ যে ব্যক্তি পরিত্যাগ করে, সে তার অন্তরের সন্দেহও হৃদয়ের ব্যাধিতে পতিত হবার ফলে এবং আল্লাহ কর্তৃক আদিষ্ট জিহাদ ছেড়ে দেয়ায় আসলে ফিত্নার মধ্যে পড়েই আছে।

এ বিষয়টি সূক্ষ্মভাবে অনুভব করে দেখুন ... কেননা নিশ্চয়ই এটা ভয়ানক স্থান। নিশ্চয়ই এখানেই মানুষ তিন শ্রেণীভুক্ত :

- ❋ এক শ্রেণী– তারা আদেশও দেয়, নিষেধও করে, আবার জিহাদ (সংগ্রাম)ও করে তারা মনে করেছে যে, ফিত্নার মূলোৎপাটন করার জন্যই এসব করছে কিন্তু আসলে তাদের ঐ কর্ম-কাণ্ডই হচ্ছে মস্ত বড় ফিত্নাহ্। উদাহরণে ঐ সকল যোদ্ধাদের উল্লেখ করা যেতে পারে যারা জাতির অভ্যন্তরীণ গোলযোগ তথা বিপদের সময় অস্ত্র ধরেছিল। যেমন 'খারিজী সম্প্রদায়' ও অন্যান্য সম্প্রদায়সমূহ।

❋ দ্বিতীয়তঃ এমন সব সম্প্রদায় যারা ঐ সৎকাজের আদেশ করা, অসৎকাজ হতে নিষেধ করা ও যুদ্ধ করা হতে পিছিয়ে থাকে যা দ্বারা ধর্ম পুরোপুরিই আল্লাহ্র হয়ে যায় এবং আল্লাহ্র ভাষ্যই সবার ঊর্ধ্বে স্থান পায়। তারা পিছিয়ে থাকে এজন্য যে, তারা যেন বিপদে পতিত না হয়, অথচ তারা ঐ বিপদে পড়েই আছে।

সূরা তাওবাহ্/'বারা'আহ্'-তে বর্ণিত যে ফিত্নাহ্ (বিপদ), সুন্দর চেহারায় আকৃষ্ট হয়ে ফিত্নায় পতিত হবার কথা তাতে রয়েছে। আর আয়াতটি নাযিল হবার কারণও সেটাই। যারা নিজদেরকে ধার্মিক বলে মনে করে, তাদের অনেকেরই এ অবস্থা। তাদের উপর অপরিহার্য হয়েছে, এমন

সব কাজ– সৎকাজের আদেশ দেয়া, অসৎকাজ হতে নিষেধ করা– যা দ্বারা পূর্ণ ধর্মটাই একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য হয়ে যাবে এবং আল্লাহ্‌র কালিমাহ সুউচ্চ হবে, তারা ছেড়ে দিচ্ছে যাতে তারা রিপুর তাড়নায় ফিত্‌নায় পতিত না হয়। অথচ তারা তাদের মিথ্যা ধারণা অনুযায়ী যে ফিত্‌নাহ্‌ হতে বাঁচার জন্য পলায়ন করেছিল, তদপেক্ষা অধিক বড় ফিত্‌নাতে ইতোমধ্যেই পতিত হয়েছে।

আসলে তাদের কর্তব্য হল, আদেশ দান ও নিষেধ প্রদানের মত গুরুদায়িত্ব পালন করা এবং নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ পরিহার করা। ওয়াজিব আদায় করা ও নিষিদ্ধ বিষয় ত্যাগ করা (এ দু'টি কাজই) ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। যেহেতু তাদের নাফ্‌সসমূহ ঐ দু'টি কাজই একত্রে পালন করা বা পরিহার করা ছাড়া তাদের আনুগত্যই করবে না। যেমন অনেকেই যারা রাজত্ব, ধন-সম্পদ অথবা পথভ্রষ্টকারী প্রবৃত্তি (রিপু) পছন্দ করে থাকে। এমতাবস্থায় সে যদি তার উপর আরোপিত ওয়াজিব বিষয়, যেমন আদেশ করা, নিষেধ করা, জিহাদ করা ও নেতৃত্ব দান করা (আমীর হওয়া)-এর মত কাজ করতে যান তবে তাকে কিছু অবৈধ কাজ অবশ্যই করতে হবে।

এমতাবস্থায় তার অবশ্য কর্তব্য হলো : সবচাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ কাজটির প্রতি দৃষ্টি দেয়া। সুতরাং যদি আদিষ্ট বিষয়টি নিষিদ্ধ বিষয়টিকে ছেড়ে দেয়ার চাইতে অধিক সাওয়াবের হয়ে থাকে, তাহলে ঐ বিষয়টির সাথে সেটা অপেক্ষা কম ফাসাদের কোন বিষয় জড়িত হবার ভয়ে তাকে ছেড়ে দিবে না। আর যদি নিষিদ্ধ (হারাম) বিষয়টি ছেড়ে দেয়া (আদিষ্ট বিষয়টির চাইতে) অধিক সাওয়াবের কাজ হয়ে থাকে, তাহলে সেটা অপেক্ষা কম সাওয়াবের কোন ওয়াজিব কাজের সাওয়াব পাবার আশায় সেটা হাত ছাড়া হবে না। আর সেটা, যখন দু'টি পাপ ও পূণ্যের কাজ পাশাপাশি একত্র হয়ে যাবে, তখন ঐরূপ করতে হবে। আর এ কাজ এ রকমই। তার বিশ্লেষণ করতে গেলে কথা দীর্ঘ হয়ে যাবে।

আদেশ ও নিষেধের ক্ষেত্রে আদম সন্তানদের পূর্ণতার অন্তর্ভুক্ত বিষয়

পৃথিবীর বুকে প্রত্যেকটি মানুষ তার আদেশ করা ও নিষেধ করা ছাড়া চলবে না এবং তাকেও আদেশ করা হবে ও নিষেধ করা হবে তা ভিন্ন কোন উপায় নেই। এমনকি সে একাকী হলেও নিজেকে নিজেই আদেশ দিবে ও নিষেধ করবে, সেটা হয়ত সৎকাজের না হয়ত অসৎকাজের হবে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেছেন :

﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾

"নাফ্স তো মন্দ কাজেরই প্ররোচনা দিয়ে থাকে।"

(সূরা ইউসুফ ১২ : ৫৩)

নিশ্চয়ই আদেশ হলো কোন কাজ করতে বলা ও সেটার বাসনা করা। আবার নিষেধ হলো কোন কাজ পরিত্যাগের বাসনা করা। আর প্রত্যেক প্রাণীরই তার অন্তরে আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা আছে এবং ঐ কারণেই সে নিজের কাজের প্রয়োজনবোধ করে, যদি পেরে উঠে, তাহলে অন্যের কাজেরও প্রয়োজন অনুভব করে। যেহেতু ইন্সান জীবন্ত সে স্বীয় ইচ্ছায় চলাফেরা করে। আর আদম সন্তানগণ পরস্পর মিলে মিশে ছাড়া জীবন-যাপন করতে পারে না।

যদি তারা দু'জন বা ততোধিক ব্যক্তি একত্রে মিলিত হয়, তাহলেই তাদের মধ্যে কোন বিষয়ে আদেশ এবং কোন না কোন বিষয় হতে নিষেধ করা না হয়েই পারে না। আর এজন্যই তো নামাযের মধ্যে সবচাইতে কম সংখ্যার জামা'আত হলো দু'জনের জামা'আত। যেমন কথিত আছে :

"الإثنان فما فوقهما جماعة.

"দু'জন বা ততোধিকই হলো জামা'আত।" কিন্তু সেটা যখন সম্মিলিত নামাযের মধ্যেই পাওয়া গেল, যা মাত্র দু'জনের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে : একজন ইমাম, দ্বিতীয়জন মুক্তাদী। যেমন নাবী ﷺ মালিক বিন আল-হুওয়াইরিস ও তার সাথীদেরকে বলেছিলেন :

إذا حضرت الصلاةُ فأذّنا وأقيما وليومكما أكبركما

"যখন নামাযের সময় উপস্থিত হবে তখন তোমরা আযান দিবে এবং ইকামাত দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত বড় সে যেন তোমাদের ইমামাতি করে।* কারণ তাঁরা কুরআন পাঠের দিক হতে কাছাকাছি যোগ্যতা সম্পন্ন ছিলেন। (এটা গেল বিশেষ বিশেষ দিকের কথা), আর যদি সাধারণ বিষয়সমূহের দিকে দেখি, তবে নাবী ﷺ-এর আদর্শে পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

لايحل لثلاثة يكونون فى سفر إلاّ أمّروا عليهم أحدهم.

"যদি মাত্র তিনজন ব্যক্তি কোন ভ্রমণে বের হয়ে থাকে তবু তাদের একজনকে তাদের আমীর নিযুক্ত না করলে (ঐ জীবন যাপনই) বৈধ হবে না।" (মূল গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)

যখন আদেশ করা ও নিষেধ করা আদম সন্তানদের পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত, তখন সে ব্যক্তি সৎকাজের আদেশ না করে, যার আদেশ দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ ও তদীয় রাসূল ﷺ, এবং অসৎকাজ হতেও বিরত করে না, যা হতে স্বয়ং আল্লাহ ও তদীয় রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন এবং সৎকাজেও আদিষ্ট হয় না, যার আদেশ করেছেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ আবার কোন অসৎকাজ হতে

---

* হাদীসটি– বুখারী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্, আবূ দাঊদ, দারিমী, তিরমিযী ও ইবনে হাম্বল প্রমুখ সঙ্কলন করেছেন।

নিষেধকৃতও হয় না, যা হতে স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন। তবুও তাঁকে সৎকাজের আদেশ করতেই হবে এবং অসৎকাজ হতেও নিষেধ করতে হবে অবশ্যই এবং তাকেও সৎকাজের জন্য আদেশ করা হবে এবং অসৎকাজ হতেও তাকে নিষেধ করা হবে, নচেৎ চলবে না। হয়ত যাতে সৎকাজ ও অসৎকাজ (পরস্পর বিরোধী কাজের আদেশ করার জন্য অথবা) যাতে হক্ব ও বাতিল সম্মিলিত হবে, ঐ হক যাকে বাতিলের পাশাপাশিই, আল্লাহ নাযিল করেছেন (বাতিলকে) শুধু একা নাযিল করেননি।

আর যদি থাকে (আদেশ নিষেধ না করাকে) ধর্ম বলে ধরে নিয়েই তাকে, তবে তো সেটা হবে সত্য হতে দূরে, পথভ্রষ্ট ও বাতিল ধর্ম। আর এটা হবে ঐ রকম যেমন, প্রত্যেক মানুষই জীবিত তারা স্বেচ্ছায় চলাফেরা করে, সে কর্মচঞ্চল ও হিম্মাত সম্পন্ন।

এখন যার নিয়্যাত ও কাজ নেক তথা শুভ হবে তো ভাল, অন্যথায় তার কাজ হবে ত্রুটিযুক্ত ফাসিদ, অথবা সেটা আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারও জন্য। আর সেটাই বাতিল।

যেমন আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেছেন :

﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ﴾

"নিশ্চয় তোমাদের প্রচেষ্টা বিভিন্নমুখী।" (সূরা আল-লাইল ৯২ : ৪)

এসব কার্যাবলীর গোটাটাই বাতিল; কাফিরদের কর্মকাণ্ডের শ্রেণীভুক্ত :

﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾

"যারা কাফির হয়েছে এবং (অন্যকও) আল্লাহ্‌র পথ হতে বিরত রেখেছে, আল্লাহ তাদের 'আমাল ব্যর্থ করেছেন।" (সূরা মুহাম্মাদ ৪৭ : ১)

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা আরও বলেছেন :

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوٓا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۭ بِقِيعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً ۚ حَتّٰٓى إِذَا جَآءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهُ فَوَفّٰـهُ حِسَابَهُ ۚ وَاللّٰهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۙ﴾

"আর যারা কাফির, তাদের 'আমালসমূহ যেন একটি মরুভূমির মরীচিকা, পিপাসার্ত লোক যাকে পানি বলে মনে করে, এমন কি যখন সেটার নিকটে পৌঁছাল, তখন তাতে কিছুই পেল না এবং তথায় (পানির পরিবর্তে) আল্লাহ্‌র নির্ধারিত (মৃত্যু)-কে পেল, তখন আল্লাহ তার (আয়ুর) হিসাব পুরোপুরি চুকিয়ে দিলেন এবং আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর।"

(সূরা আন্-নূর ২৪ : ৩৯)

আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা অন্যত্র বলেছেন :

﴿وَقَدِمْنَآ إِلٰى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُورًا﴾

"আর আমি তাদের ঐ সমস্ত কাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করব যা তারা করেছিল, তখন সেগুলোকে এরূপ করে দিব, যেমন উৎক্ষিপ্ত ধূলারাশি।"

(সূরা আল-ফুরক্বান ২৫ : ২৩)

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় গ্রন্থে তাঁর ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে (বান্দাকে) আদেশ করেছেন। এই সাথে মু'মিনগণের মধ্যে যারা নেতৃতস্থানীয় (দায়িত্বশীল) তাদের আনুগত্য করতেও আদেশ করেছেন। যেমন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেছেন :

﴿يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوٓا أَطِيعُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ إِنْ

كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۭ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ۝

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা উপরস্থ তাদেরও। অনন্তর যদি তোমরা কোন বিষয়ে পরস্পর দ্বিমত হও, তবে ঐ বিষয়কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট উপস্থাপিত করে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি এবং কিয়ামাত দিবসের প্রতি ঈমান রাখ; এ বিষয়গুলো উত্তম এবং এটার পরিণামও খুব ভাল।" (সূরা আন্-নিসা ৪ : ৫৯)

এখানে "উলুল আম্‌রি" দায়িত্বশীল ও সেটার অধিকারীগণ এবং ঐ সকল ব্যক্তিগণই মানুষকে সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করেন এবং তাতে শরীক হয় শক্তিশালী লোক এবং জ্ঞানী ও দার্শনিকগণ।

বিশেষতঃ এ কারণেই দায়িত্বশীলগণ দু'শ্রেণীতে বিভক্ত : "উলামা" ও "উমারা" ('আলিম শ্রেণী ও আমীর শ্রেণী)। এখন তারা যদি ভাল হন তবে সাধারণ মানুষও ভাল হবে, আর তারাই যদি খারাপ হন তবে সাধারণ মানুষও খারাপ হয়ে যাবে। যেমন– আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রাযি.) আহ্‌মাসিয়্যাহ্ যখন আবূ বাক্‌রকে জিজ্ঞেস করেছিল–

ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح

এ সৎকাজের উপর আমাদের স্থায়িত্ব কত সময় পর্যন্ত? তিনি বলেছিলেন :

ما استقامت لكم أئمتكم

"যত সময় পর্যন্ত তোমাদের নেতৃবৃন্দ সৎপথে স্থায়ী থাকবেন।"

এদের অন্তর্ভুক্ত হবেন রাজা-বাদশাহ্‌গণ, শাইখ মাশায়েখগণ, কর্মকর্তাগণ এবং মোটকথা যাদের অনুসরণ করা হয় তারা সকলেই দায়িত্বশীলগণের শ্রেণীভুক্ত।

তাদের প্রত্যেকের (উপর) করণীয় হলো : আল্লাহ যার আদেশ দিয়েছেন সেটার আদেশ দেয়া এবং আল্লাহ্ যা হতে নিষেধ করেছেন সেটা হতে নিষেধ করা এবং তার আনুগত্য করা যাদের জন্য অপরিহার্য, তাদের করণীয় হলো : যে সকল বিষয়ে (আনুগত্য করলে) আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য হবে শুধু সে সকল বিষয়েই তার আনুগত্য করবে; আর আল্লাহ্র সাথে অবাধ্যতা হবে এমন কোন বিষয়েই তার প্রতি আনুগত্য করবে না। যেমন আবূ বাক্র সিদ্দীক (রাযি.) যখন মুসলিমগণের (খিলাফাতের) দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং যে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন, তখন বলেছিলেন :

"أيها النّاس! القويُ فيكم الضعيفُ عندي حتى آخذَ منه الحقّ والضعيفُ فيكم القويُ عندى حتى آخذَ له الحقَ أطيعونى ما أطعتُ اللّهَ ورسولَه فإذا عصيتُ اللّه ورسولَه فلا طاعةَ لِيْ عليكم"

“হে লোক সকল! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি শক্তিশালী (অন্যের উপর যুল্ম করতে পারে) আমার নিকট সে দুর্বল, যতক্ষণ না আমি তার নিকট হতে অন্যের হক (প্রাপ্য) আদায় করব; আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি দুর্বল, (মানুষ যার উপর যুল্ম করে) সে আমার নিকট শক্তিশালী, যতক্ষণ না আমি তার হক (প্রাপ্য) তাকে পৌঁছাতে পারব (হে ভদ্রমণ্ডলী) তোমাদের ব্যাপারে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে থাকব, ততক্ষণ পর্যন্তই তোমরাও আমার আনুগত্য করো, আর যখনই আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করব, তখন হতেই আমার আনুগত্য করা তোমাদের পক্ষে কর্তব্য হবে না।”

(ইবনে কাসীর তাঁর “আল-বিদায়াহ্ ওয়ান্-নিহায়াহ্” গ্রন্থের ৫ম খণ্ড, ২৪৮ পৃষ্ঠায় আবূ বাক্র (রাযি.)-এর এ ভাষণ উল্লেখ করেছেন)

'আমালকে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই নির্দিষ্ট করা

যখন সমস্ত পুণ্য কাজে দু'টি বিষয় ছাড়া উপায় নেই, একটা হলো আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানের ইচ্ছা করা; দ্বিতীয়তঃ শারী'আত সম্মত হওয়া আর এটাই প্রয়োজন সকল কথা-বার্তা ও কার্যকলাপে, উত্তম ভাষণে, সৎ 'আমালে, পুঁথিগত বিষয়সমূহ এবং 'ইবাদাত ও বাস্তব জীবনে আর এ সম্পর্কে নাবী ﷺ হতে সহীহ্ হাদীসে পাওয়া গেছে যে, তিনি বলেছেন :

إن أوّل ثلاثة تسجر بهم جهنم : رجل تَعلّم العلم وعلّمه وقرأ القرآن وأقرأه ليقول الناسُ هُو عَالم قارئ. ورجل قاتل وجاهد ليقول الناسُ هو شجاع وجريء ورَجل تّصدّق وأعطىٰ ليقوّل الناسُ هوجوادٌ وسَخى.

"নিশ্চয়ই তিন ব্যক্তি এমন, যাদেরকে দিয়ে সর্বপ্রথম দোযখের আগুন জ্বালানো হবে।" তাদের একজন হলো যে ব্যক্তি নিজে জ্ঞান অর্জন করেছে এবং অন্যকেও সেটা শিখিয়েছে। নিজে কুরআন পড়েছে এবং অন্যকেও সেটা পড়েছে, এজন্য যে, লোকে তাকে বলবে : সে 'আলিম, সে কারী। দ্বিতীয় ব্যক্তি, যেজন যুদ্ধ করেছে, জিহাদ করেছে এজন্য যে, লোকে তাকে বলবে : সে বীর, সে সাহসী। তৃতীয় ব্যক্তি হলো, যে জন দান-খায়রাত করেছে এজন্য যে, মানুষ তাকে বলবে : সে দাতা, সে দয়ালু।"*

---

* (আন্-নাসায়ী : ৬/২৩, কিতাবুল জিহাদ-বাবু মান কাতালা লি ইউক্বালা ফুলানুন জারিইউ ভিন্ন শব্দে, সে স্থানে এসেছে– "أول الناس يقضىٰ له يوم القيمة ثلاثةٌ، رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فصرفها قال : فما عملت فيها قال : قاتلت فيك حتى استشهدتُ قال كذبت ولكنك قاتلتَ لتقال فلان جريء الخ"; ইবনে হাম্বাল : ২/৩২২; আত্-তিরমিযী; নাসায়ী কাছাকাছি শব্দে)।

এই যে তিন ব্যক্তি, যারা লৌকিকতা এবং প্রচারের আকাঙ্ক্ষা করছিল, তারাতো নাবীগণের পরেই তিন ব্যক্তির পাশের মর্যাদার যোগ্য ছিল সিদ্দীকীন, শুহাদা এবং সালিহীন।

⁜ নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি ঐ জ্ঞান অর্জন করবে– যে জ্ঞান সহকারে আল্লাহ তা'আলা তদীয় রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন এবং সে অন্যকে ঐ জ্ঞান শিক্ষা দিবে, যেন আল্লাহ সন্তুষ্ট হন, ইনিই হবেন "সিদ্দীক"।

⁜ আর যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার জন্য দান করবেন তিনিই হবেন সালিহ্।

এজন্যই সম্পদে অপচয়কারী মৃত্যুক্ষণে পুনঃ পৃথিবীর জীবনে প্রত্যাবর্তনের দরখাস্ত করবে। যেমন ইবনে 'আব্বাস (রাযি.) বলেছেন, যাকে সম্পদ দেয়া হয়েছে অথচ হাজ্জও আদায় করেনি, যাকাতও দেয়নি, সে মৃত্যু মুহূর্তে প্রত্যাবর্তন ভিক্ষা করবে। এ সুবাদে তিনি কুরআনের একটি আয়াতও পাঠ করেছেন।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেছেন :

﴿وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَّرْتَنِيٓ إِلٰٓى أَجَلٍ قَرِيبٍ ۙ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِينَ﴾

"তোমাদেরকে আমরা যে রিয্ক দিয়েছি সেটা হতে খরচ কর (আল্লাহ্র পথে) তোমাদের কারো নিকট মৃত্যু আসার পূর্বেই, তখন সে বলবে, হে আমার রব! হায় আমাকে যদি একটি নিকটবর্তী নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সুযোগ দিতেন, তাহলে আমি দান-খায়রাত করতাম এবং নেক্কারদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।" (সূরা আল-মুনাফিকুন ৬৩ : ১০)

আর এ সকল বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক বিষয়সমূহ্ এমন হওয়া প্রয়োজন, যা দ্বারা আল্লাহ ও পরকাল সম্বন্ধে সংবাদ দিবে এবং যা ছিল ও হবে সত্যরূপে নির্ভুলভাবে, আর যার আদেশ দিবে এবং যা হতে নিষেধ করবে। যেমন রাসূলগণ আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে যা নিয়ে এসেছেন তারও সংবাদ দিবে।

আর এটাই নির্ভুল, সত্য, শারী'আতসম্মত। আল্লাহ্‌র কুরআন ও তদীয় রাসূলের সুন্নাত (আদর্শ)-এর অনুসারী যেমন ঐ সকল 'ইবাদাতসমূহ যার মাধ্যমে আমরা আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত (দাসত্ব) প্রকাশ করে থাকি যদি সেটা আল্লাহ্‌র নির্ধারিত শারী'আত (বিধিবদ্ধ)-এর আওতাভুক্ত হয়ে থাকে, যার আদেশ দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তবেই সেটা হবে হক ও নির্ভুল; আল্লাহ যা সহকারে তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন এ সম্পর্কে। আর যা ঐরূপ হবে না, সেটা দু'প্রকার। যথা :

⁂ বাতিল, বিদ'আত, পথভ্রষ্টকারী এবং মূর্খতার অন্তর্গত। যদিও কেউ কেউ তাকে নাম দিবে : বিজ্ঞান, জ্ঞানলব্ধ বিষয়সমূহ, 'ইবাদাত, মুজাহাদাহ, রুচিসমূহ এবং অবস্থা অনুযায়ী কথাসমূহ ইত্যাদি।

সেটা এমন হওয়াও প্রয়োজন যে, আল্লাহ্‌র আদেশের পরিপ্রেক্ষিতেই সেটার আদেশ করা হবে এবং আল্লাহ্‌র নিষেধের কারণেই সেটা হতে নিষেধ করা হবে এবং ঐসব সম্পর্কে সংবাদ দিবে, যার সংবাদ দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ। কেননা সেটাই তো হক, ঈমান এবং হিদায়াত। যেমন রাসূলগণ ঐ সম্পর্কেই সংবাদপ্রাপ্ত হয়েছেন। যেমন 'ইবাদাতসমূহ দ্বারা ও (একমাত্র) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনই লক্ষ্য হওয়া দরকার।

এখন ঐ কথা যদি প্রবৃত্তির অনুসরণ ও উত্তেজনার জন্য, অথবা মর্যাদা ও 'ইল্ম জাহির করার জন্য অথবা প্রচার ও লোক দেখাবার জন্য বলা হয়, তবে তো সে চলে যাবে ঐ যোদ্ধার পর্যায়ে, সে যোদ্ধা বীরত্ব দেখাবার জন্য, উত্তেজনার বশে এবং লোক দেখাবার বাসনায় যুদ্ধ করে থাকে।

আর এখানে তোমার কাছে স্পষ্ট হবে যে অনেক 'উলামা ও দার্শনিকগণ কিসের মধ্যে পড়ে রয়েছে, আর 'আবিদ ও আত্মবিস্মৃতগণই বা কিসে ডুবে আছে? ঐ সকল লোকেরা অনেক সময় এমন সব কথা-বার্তা বলে থাকে, যা কুরআন ও হাদীসের বিপরীত অথবা সুন্নাত ও এ সম্পর্কিত বিষয়ের যা বিপরীত তার অন্তর্গত। **আবার অনেক সময় তারা এমন সব 'ইবাদাত (কার্যক্রম)-কে 'ইবাদাত মনে করে পালন করে, যার কোন আদেশ আল্লাহ তা'আলা দেননি। বরং সেটা হতে নিষেধই করেছেন।** অথবা যা হালাল ও হারামকে সংশ্লিষ্ট করে। আর তারা অনেক সময় এমন যুদ্ধই করে যা আদিষ্ট (বৈধ) যুদ্ধের বিপরীত, অথবা আদিষ্ট ও নিষিদ্ধ যুদ্ধকে শামিল করে এরূপ।

অতঃপর এ তিন শ্রেণী আদেশকৃত ও হারামকৃত এবং উভয়বিধ বিষয়কে যা সংশ্লিষ্ট করে– সেটার কর্তার নিয়্যাত কখনও সৎ হতে পারে আবার কখনও বা তার প্রবৃত্তির অনুসরণেও হতে পারে, আবার কোন সময় এ রকম ও ঐ রকম এ উভয়ই মিলিত হয়ে যেতে পারে।

এ সকল বিষয়সমূহে এ নয়টি শ্রেণী আছে। ওদিকে সেটার উপর খরচকৃত মাল-সম্পদ, যেমন সরকারী সম্পত্তি "ফাই" ইত্যাদি, ওয়াক্ফ সম্পত্তিসমূহ, ওয়াসীয়াতকৃত সম্পত্তি এবং মানতের সম্পদসমূহ এবং বিভিন্ন ধরনের দান-খায়রাত ও সাহায্য সহযোগিতার সম্পত্তি ইত্যাদি।

আর এসবই হলো সত্য (হক)-কে অন্য আর একটি খারাপ কাজের সাথে মিশানো।

এ খারাপ কাজটি হতে পারে সেটার কর্তা ভূলবশতঃ সেটা করে ফেলেছেন অথবা বিস্মৃত হয়েছেন। এমন হলে তিনি ক্ষমাপ্রাপ্ত। যেমন– মুজ্তাহিদ, যিনি ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তবু তাঁর একগুণ পুরস্কার এবং তার ভুল ও মার্জনাযোগ্য আবার হয়ত সগীরা গুনাহ্ হয়ে থাকবে, যা

কাবীরা গুনাহ্ হতে বেঁচে থাকার ফলে ঢাকা পড়ে যায়। আবার কখনও বা তাওবাহ্ করার দরুনও সেটা ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। অথবা পূণ্য অর্জনের ফলে যা পাপকে মোচন করে ফেলে। অথবা পার্থিব বিপদাপদের কারণে ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়, বা অনুরূপ।

ভাল করে (এ বিষয়ে) বুঝে নাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র দীন, যা সহ তিনি তদীয় গ্রন্থসমূহ অবতীর্ণ করেছেন, রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে; এসবই একমাত্র আল্লাহ তা'আলা (তার বান্দা হতে) নেক 'আমাল ইচ্ছা করেন বলেই। আর এটাই হলো সাধারণ ইসলাম, যা ব্যতীত আল্লাহ তা'আলা আর কিছুই কারও নিকট হতে গ্রহণ করবেন না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা তা স্পষ্টভাবে বলেছেন :

﴿وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ج وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ﴾

"আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম অন্বেষণ করবে, তবে সেটা তা হতে গৃহীত হবে না। আর সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (সূরা আ-লি-'ইমরান ৩ : ৮৫)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা আরও বলেছেন :

﴿شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لا وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ ط لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ط ۞ اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ قف﴾

"আল্লাহ সাক্ষ্য প্রদান করেছেন যে, নিশ্চয়ই ঐ (পাক) সত্তা ভিন্ন অন্য কেউ মা'বূদ হওয়ার যোগ্য নয়, আর ফেরেশ্‌তাগণ এবং জ্ঞানীগণও আর মা'বূদ তিনি এরূপ যে, ন্যায়ের সাথে শৃঙ্খলা রক্ষাকারী। তিনি ভিন্ন আর কেউ মা'বূদ হওয়ার যোগ্য নয়। তিনি পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র নিকট শুধু ইসলামই একমাত্র মনোনীত জীবন বিধান (ধর্ম)।"

(সূরা আ-লি 'ইমরান ৩ : ১৮-১৯)

Contents

ইসলাম-এর মর্মকথা

"আল-ইসলাম" শব্দটি দু'টি অর্থ প্রকাশ করে। তাদের একটি হলো আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য। অতএব (মুসলিম) অহংকারী হবে না। দ্বিতীয়টি হলো একনিষ্ঠতা; একত্ববাদ, নির্দিষ্টকরণ (ইখলাস)।

যেমন– আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলার বাণীতে আছে :

﴿وَرَجُلاً سَلَمًا لِرَجُلٍ﴾

"একজন ব্যক্তি নির্ধারিতভাবে একজন ব্যক্তির জন্য।" (সূরা যুমার ৩৯ : ২৯)

সুতরাং সে মিলিতভাবে নয়। আর সেটা হলো যে, বান্দা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা– যিনি বিশ্বপ্রতিপালকের নিকটই আত্মসমর্পণ করবে। যেমন– আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেছেন :

﴿وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرٰهِيمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ط وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا ج وَإِنَّهُ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ لا قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِينَ ۞ وَوَصّٰى بِهَا إِبْرٰهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ط يٰبَنِيَّ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ط﴾

"ইব্‌রাহীমের ধর্ম হতে ঐ ব্যক্তিই মুখ ফিরাবে, যে মূলতঃই নির্বোধ আর আমি তাকে দুনিয়ায় নির্বাচিত করেছি এবং তিনি আখিরাতেও অতি মহৎ লোকদের মধ্যে পরিগণিত। যখন তাকে তার প্রভূ বললেন, "অনুগত হও", তিনি বললেন : আমি অনুগত হলাম বিশ্বপালকের। আর এটার হুকুম

করে গিয়েছেন ইব্‌রাহীম নিজ সন্তানদেরকে এবং ইয়া'কূবও, হে আমার সন্তানগণ! আল্লাহ এ ধর্মকে তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন। সুতরাং তোমরা ইসলাম ব্যতীত আর কোন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না।"

(সূরা আল-বাকারাহ্ ২ : ১৩০-১৩২)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেছেন :

﴿قُلْ إِنَّنِي هَدٰنِي رَبِّيٓ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ج دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرٰهِيمَ حَنِيفًا ج وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۞ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ لا ۞ لَا شَرِيكَ لَهُ ج وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾

"আপনি বলে দিন, আমার রব আমাকে একটি সরল পথপ্রদর্শন করেছেন, এটা একটি সুদৃঢ় ধর্ম, যা ইব্‌রাহীমের ধর্মাদর্শ, যাতে একটুও বক্রতা নেই এবং তিনি মুশ্‌রিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। আপনি বলে দিন, নিশ্চয়ই আমার নামায এবং আমার সকল 'ইবাদাত এবং আমার জীবন এবং আমার মরণ এ সমুদয় একমাত্র আল্লাহ্‌রই জন্য, যিনি সমগ্র বিশ্বের অধিপতি। তাঁর কোন শারীক নেই এবং আমার প্রতি এটারই আদেশ হয়েছে এবং আমি সমস্ত অনুগতদের মধ্যে প্রথম অনুগত।"

(সূরা আল-আন'আম ৬ : ১৬১-১৬৩)

(الإسلام) "লাজেম" অকর্মক ব্যবহৃত হয় আবার লাম অক্ষর দ্বারা "মুতাআদ্দি" সকর্মক হয়ে থাকে। যেমন এ আয়াতসমূহে (পূর্বে বর্ণিত) এসেছে।

যেমন আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেছেন :

Contents

وَ اَنِيْبُوْٓا اِلٰى رَبِّكُمْ وَ اَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ۝

"তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সমীপে প্রত্যাবর্তন কর এবং তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ কর, তোমাদের প্রতি 'আযাব আসার পূর্বে, অতঃপর তোমরা সাহায্যকৃত হবে না।" (সূরা আল-যুমার ৩৯ : ৫৪)

যেমন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা ভাষ্য :

﴿ قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ع﴾

"বিলকীস বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার নিজের উপর যুল্ম করেছি এবং আমি সুলাইমানের সাথে বিশ্ব প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম।" (সূরা আন্-নাম্ল ২৭ : ৪৪)

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেছেন :

﴿ اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ﴾

"তবে কি তারা আল্লাহ্র ধর্ম ব্যতীত অন্য কোন পন্থা অন্বেষণ করে? অথচ আল্লাহ্র সমীপে সমস্তই নতশির রয়েছে, যা কিছু আসমানসমূহে এবং যা কিছু যমীনে আছে ইচ্ছায় এবং অনিচ্ছায়। আর সমস্তকে আল্লাহ্রই দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে।" (সূরা আ-লি 'ইমরান ৩ : ৮৩)

যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেছেন :

﴿قُلْ أَنَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ ص لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا ط قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى ط وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ لا ۞ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ ط﴾

"আপনি বলে দিন, আমি কি আল্লাহ্‌কে ছেড়ে এমন বস্তুর 'ইবাদাত করব যে আমাদের উপকারও করতে পারে না এবং আমাদের অপকারও করতে পারে না, আর আমরা কি বিপরীত দিকে ফিরে যাব? আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হিদায়াত করার পর ঐ ব্যক্তির ন্যায়? শয়তান যাকে প্রান্তরে পথহারা করে দেয়, আর সে দিশাহারা অবস্থায় ঘুরে থাকে, (অথচ) তার কতিপয় সঙ্গীও ছিল, যারা তাকে সঠিক পথের দিকে আহ্বান করছে যে, আমাদের দিকে আস। আপনি বলে দিন, নিশ্চয়ই প্রকৃত সরল পথ শুধু আল্লাহ্‌রই পথ আর আমরা আদিষ্ট হয়েছি যে, আমরা বিশ্ব প্রতিপালকের পূর্ণ অনুগত হই আর এটাও যে, নামায কায়িম কর এবং তাকে ভয় কর।"

(সূরা আল-আন'আম ৬ : ১৬১-১৬৩)

আবার "মুতাআদ্দি" সকর্মক ও ব্যবহৃত হয়, তখন ধাতু নির্গত ক্রিয়া যোগ থাকে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেছেন :

﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى ط تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ط قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۞ بَلَى ق مَنْ أَسْلَمَ

Contents

وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ اَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ص وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴾

"তারা বলেছে, যারা ইয়াহূদী অথবা নাসারা হবে শুধু তারা ব্যতীত আর কেউই জান্নাতে প্রবেশই করতে পারবে না, সেটা তাদের আকাঙ্ক্ষা মাত্র; আপনি বলে দিন, তোমাদের কথার (দাবীর) সমর্থনে তোমাদের প্রমাণ আন, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। তবে হ্যাঁ, যে ব্যক্তি তার মুখমণ্ডল (সত্ত্বা)-কে আল্লাহ্‌র সমীপে সোপর্দ করে এবং সে মুহ্‌সিন তথা উচ্চস্তরের নিষ্ঠাবানও; তার জন্য পুরস্কার রয়েছে তার প্রতিপালকের কাছে, তাদের কোন ভীতিও নেই আর তারা চিন্তিতও হবে না।"

(সূরা আল-বাকারাহ্ ২ : ১১১-১১২)

যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা আরও বলেন :

﴿ وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ط وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ﴾

"আর এরূপ ব্যক্তির ধর্ম অপেক্ষা কার ধর্ম অধিক উত্তম হবে? যে ব্যক্তি স্বীয় চেহারা আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকিয়ে দেয় এবং সে নিষ্ঠাবানও হয় এবং সে মিল্লাতে ইব্‌রাহীমীর অনুসরণও করে, যাতে বক্রতার লেশ নেই এবং আল্লাহ তা'আলা ইব্‌রাহীমকে স্বীয় খাঁটি বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছিলেন।"

(সূরা আন্‌-নিসা ৪ : ১২৫)

এ দীনের চাইতে উত্তম কোন ধর্ম হতে পারে, আল্লাহ তা'আলা এটা স্বীকার করেছেন। এ দীন হলো নিষ্ঠার সাথে স্বীয় সত্তাকে আল্লাহ্‌র সমীপে সোপর্দ করা। আল্লাহ তা'আলা তো ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, নিশ্চয়ই প্রত্যেক ব্যক্তিই যিনি নিজের মস্তক নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ তা'আলার সামনে

নুইয়ে দিবে, তার প্রতিপালকের নিকট তার জন্য পুরস্কার রয়েছে। আর **এমন** লোকদের কোন ভয়ও থাকবে না, আর তারা চিন্তান্বিতও হবে না।

এ ব্যাপক কথাটি এবং সার্বজনীন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ঐ ভ্রান্ত ধারণাকারীর ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করেছে, যে মিথ্যাচার করত যে, "ইয়াহূদী অথবা নাসারা (খৃষ্টান) হওয়া ব্যতীত কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না।" আল্লাহ্‌র সমীপে আপন মাথা অবনমিত করে পূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং নিষ্ঠা– এ দু'টি গুণ হলো মৌলিক বিষয়, যার বর্ণনা আগেই হয়ে গেছে। তার পূর্ণতা হলো : সকল কার্যক্রমকেই একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য নির্ধারণ করা এবং সেটা যেন সঠিক, সুন্নাহ্ ও শারী'আত মুতাবিক হয়।

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য উদ্দেশ্য ও নিয়্যাতের প্রয়োজন অপরিহার্য

সেটা এরূপ... যে আল্লাহ্‌র জন্য চেহারা (মস্তক) অবনত করায় উদ্দেশ্য ও নিয়্যাত সংশ্লিষ্ট যে, সেটা আল্লাহ্‌র জন্য। যেমন কোন একজন বলেছেন : আমি আল্লাহ্‌র কাছে ঐ গুনাহের জন্য ক্ষমা চাচ্ছি যার হিসাব নেই। তিনি সকল বান্দার প্রভু, তারই দিকে আমার মুখমণ্ডল, তারই জন্য আমার যাবতীয় কর্মকাণ্ড।

এখানে চারটি শব্দ ব্যবহার করেছেন : মুখমণ্ডল (মস্তক) অবনত করা, মুখাবয়ব প্রতিষ্ঠিত করা, সোজা রাখা।

যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেছেন :

﴿وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾

"তোমরা প্রত্যেক সাজদাহ্‌র সময় স্বীয় মুখমণ্ডল সোজা রেখও।"
(সূরা আল-আ'রাফ ৭ : ২৯)

আল্লাহ তা'আলা অনুরূপ আরও বলেছেন :

﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ﴾

"অতএব তোমরা একনিষ্ঠভাবে স্ব স্ব লক্ষ্য এ ধর্মের প্রতি রাখ; আল্লাহ প্রদত্ত (সত্য উপলব্ধি) সে যোগ্যতার অনুসরণ করে চল, যার উপর আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছে।" (সূরা আর-রূম ৩০ : ৩০)

মুখমণ্ডল ফিরানো : যেমন খালীলুল্লাহ্ ইব্‌রাহীম (‘আ.)-এর কথা :

﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَّمَآ أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ج﴾

“আমি একাগ্রতার সাথে স্বীয় মুখমণ্ডল তাঁরই দিকে ফিরাচ্ছি, যিনি আসমানসমূহ ও যমীনকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশ্‌রিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।” (সূরা আল-আন্‌'আম ৬ : ৭৯)

নাবী ﷺ অনুরূপই রাত্রে নামায আরম্ভ করার দু'আয় বলতেন :

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَّمَآ أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

(ইবনে হাম্বাল : ৪/২৯৯-৩০০; মুসলিম : ৮/৭৭-৭৮, কিতাবুয্ যিক্‌র আদ্ দু'আ-ওয়াত্তাওবাহ্); ইবনে মাজাহ্ : ২/১৫, হা: নং- ৩৮৮৬, কিতাবুদ্ দু'আ)

দু’খানি সহীহ্ হাদীস গ্রন্থে (বুখারী ও মুসলিম) বারা বিন ‘আযিব (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ তাঁকে শিখিয়েছেন যে, যখন বিছানায় শুতে যাবে তখন যেন সে বলে :

اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك (الحديث)

“হে আমার আল্লাহ! আমার প্রাণকে তোমারই কাছে সোপর্দ করলাম, এবং আমার মুখমণ্ডলকে তোমারই দিকে ফিরালাম।” (বুখারী : ৯/৯২, কিতাবুত্ তাওহীদ এবং মুসলিমে একটু ভিন্ন শব্দে ৮/৭৭-৭৮, কিতাবুদ্ দু'আ)

সুতরাং মুখমণ্ডল যিনি ফিরাল এবং যাঁর দিকে ফিরানো হয় উভয়কেই শামিল করে এবং যেদিকে মুখ ফিরানো হয় তাও বুঝায়। যেমন বলা হয়– তুমি কোন্ দিক চাও? অর্থাৎ– কোন্ পানে বা দিকে উদ্দেশ্য করছো?

সেটা এজন্য যে, তারা উভয়ে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং মানব যে দিকেই ফিরবে, কোন একদিকে তো ফিরবে, তার চেহারা তার সাথেই ফিরবে এটাই বিধি। আর এটা তার ভিতর-বাহির সর্বত্রই। অতএব সেটা হলো চারটি বিষয়; আসলে ভিতরই হলো– মূল, আর যখনই তার অন্তর কোন জিনিসের প্রতি লক্ষ্য করে, তখন তার বাহ্যিক চেহারা ও সেটার অনুসরণ করে থাকে।

অতএব বান্দার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং খেয়াল যদি আল্লাহ্‌রই দিকে হয়, আর এটাই হলো তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সততা। আর এই সাথে সে যদি নিষ্ঠাবান হয়ে থাকে, তবে তো তার জন্য একত্রে মিলিয়ে গেছে যে, তার 'আমাল সৎ হবে, এবং সে তার প্রভুর 'ইবাদাতে আর কাউকেও শরীক করবে না। আর সেটাই ছিল 'উমার (রাযি.) দু'আ :

اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئًا.

"হে আমার আল্লাহ! আমার কাজ কর্ম সবগুলোই নেক বানাও এবং তাকে একমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য নির্ধারিত কর এবং তাতে অন্য কারও জন্য কোন কিছুই রেখো না।"
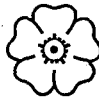
নাবীর সুন্নাত মুতাবিক অনুসরণ অপরিহার্য

নেক কাজ হলো 'ইহ্সান' 'নিষ্ঠা' আর সেটা হলো পূর্ণ কাজসমূহ। যার আদেশ দিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা। আর আল্লাহ যার আদেশ দিয়েছেন সেটাই আল্লাহ্র সুন্নাত ও তদীয় রাসূল ﷺ-এর সুন্নাত সম্মত।

আল্লাহ তা'আলা তো সংবাদ দিয়েই দিয়েছেন নির্ধারিত করবে, এবং তার কাজে নিষ্ঠাবান হবে, সে তবে নিশ্চয়ই পুরস্কারের যোগ্য হবে, এবং শাস্তি হতে মুক্ত থাকবে।

আর বিশেষতঃ এজন্যই সাল্ফে সালিহীন ইমামগণ (রহ.) এ দু'টি মৌলিক বিষয়ের সমন্বয় ঘটাতেন, যেমন ফুযাইল বিন ইয়াজ (রহ.) আল্লাহ্র এ কথা :

﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ﴾

"যেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন যে, তোমাদের মধ্যে কে কাজে অত্যুত্তম"– (সূরা হূদ ১১ ঃ ৭)। সম্পর্কে বলেছেন : أخلصه وأصوبه

"সবচাইতে বেশী শুদ্ধ ও আল্লাহ্র জন্য সবচাইতে বেশী নির্ধারিত ('আমাল)। অনন্তর তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল সবচাইতে বেশী শুদ্ধ ও আল্লাহ্র জন্য সবচাইতে বেশী নির্ধারিত কি? জবাবে তিনি বললেন : নিশ্চয়ই 'আমাল যদি সঠিক হয়, অথচ আল্লাহ্র জন্য "খালিস" (নির্ধারিত) না হয়, তবে সেটা গৃহীত হবে না। আবার যদি 'আমাল খালিস (আল্লাহ্র জন্য) হয় অথচ সঠিক না হয়, তবুও সেটা গৃহীত হবে না যে পর্যন্ত না তা ('আমাল) খালিস হয় এবং সঠিক হয়। খালিস বলতে, কাজটি যেন একমাত্র আল্লাহ্র জন্য হয়। আর সঠিক বলতে 'আমালটি যেন সুন্নাত মুতাবিক হয়।

ইবনে শাহীন এবং লা-লাকায়ী, সা'ঈদ বিন জুবাইর হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : "শুধু কোন কথা গৃহীত হবে না, যদি তদানুযায়ী 'আমাল না পাওয়া যায়, আবার নিয়্যাত ব্যতীত কোন কথা এবং 'আমালও গৃহীত হবে না আর কোন কথা, কাজ এবং নিয়্যাতও গৃহীত হবে না, যদি সেটা সুন্নাত মুতাবিক (অনুসরণ) না হয়।"

হাসান বাস্‌রী (রহ.) হতেও অনুরূপই বর্ণিত আছে। তবে তিনি "لا يقبل" এর স্থলে "لا يصلح" "গ্রহণযোগ্য হবে না" বলেছেন। আর এ বর্ণনাটি "মুরজিয়া" সম্প্রদায়ের দাবী খণ্ডন করছে, যারা বলছে যে, নিয়্যাত ও 'আমালের কোন দরকার নেই, বরং শুধু মুখের কথাই যথেষ্ট।

ঐ বর্ণনা আমাদেরকে এ সংবাদ দিয়েছে যে, কথা এবং কাজ ছাড়া উপায় নেই। কাজেই প্রতীয়মান হলো যে, ঈমান হলো কথা (ও তার সাথে) 'আমাল। এ দু'টো ছাড়া আর কোন উপায় নেই। যেমন অনত্র বিশদ আলোচনা করেছি এবং স্পষ্ট বর্ণনা করেছি যে, শুধু অন্তরের বিশ্বাস ও মুখের কথা আল্লাহ্‌দ্রোহীতা, তাঁর বিধানসমূহের প্রতি অনীহা এবং আল্লাহ ও তাঁর বিধানসমূহের উপর দিয়ে আত্মম্ভরিতা থাকলে ঈমান হবে না, এ বিষয়ে মু'মিনগণের একমত সিদ্ধান্ত রয়েছে, যে পর্যন্ত না বিশ্বাসের সাথে নেক 'আমাল যুক্ত হবে।

আসল 'আমাল হলো অন্তরের 'আমাল। আর সেটা হলো ভালবাসা, এবং এরূপ সম্মান প্রদর্শন করা যাতে গর্ব বা অহংকারের লেশমাত্রও সংশ্লিষ্ট থাকবে না।

অতঃপর তারা বলেছেন "কথা ও 'আমাল নিয়্যাত ছাড়া গৃহীত হবে না।" এটাতো দিবালোক সদৃশ স্পষ্ট, কেননা কথা ও কাজ যদি একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য নির্ধারিত না হয় তবে আল্লাহ তা'আলা সেটা গ্রহণ করবেন না।

অতঃপর তারা বলেছেন : কথা, কাজ ও নিয়্যাত গৃহীত হবে না যদি সেটা সুন্নাত অনুযায়ী না হয়। আর সেটাই হলো শারী'আত, সেটাই তো যার আদেশ দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ্ই ও তাঁর রাসূল ﷺ। কেননা কথা, কাজ ও নিয়্যাত যা সুন্নাত মুতাবিক, বিধিবদ্ধ, যার আদেশ দিয়েছেন আল্লাহ এরূপ না হয়, সেটা আসলে "বিদ্'আত"। "আর প্রত্যেকটি বিদ'আত-ই গুমরাহী পথভ্রষ্টতা" যা আল্লাহ তা'আলা মোটেই পছন্দ করেন না। সুতরাং সেটা গ্রহণও করবেন না। আর সেটা গ্রহণের যোগ্যও নয়। সেটা মুশরিক ও আহ্লি কিতাবগণের 'আমালের মত।

উলামা-ই-সাল্ফগণের কথায় যে "السُّنَّةُ।" শব্দটি : সেটা 'ইবাদাতে সুন্নাত এবং বিশ্বাস তথা 'আকীদাহ্সমূহে সুন্নাত বুঝিয়ে থাকে। যদিও অনেকে সুন্নাতের অনেক শ্রেণী শাখা-প্রশাখা বের করেছেন। তারা মনে করেছেন 'আকীদাহ্সমূহ সম্পর্কে কথা। আর এটা ইবনে মাস'ঊদ, উবাই বিন কা'ব এবং আবূ দারদা (রাযি.) প্রমুখের কথারই ন্যায় :

اقتصاد في سنة خير من اجتهاد فی بدعة

"একটি সুন্নাতের উপর 'আমাল করাকে যথেষ্ট মনে করা, একটি বিদ'আতের উপর ইজ্তিহাদ করার চাইতে অত্যধিক ভাল" প্রভৃতি।

আল্লাহ্ তা'আলা– আমি তার পবিত্রতা ঘোষণা করছি তিনিই সর্ববিষয়ে অধিক জ্ঞাত। ওয়া সাল্লাল্লাহু ওসাল্লামা ওয়া বা-রাকা 'আলা 'আবদিহি ওয়া রাসূলিহি মুহাম্মাদ, ওয়া মান্ তাবিআহু বিইহ্সানিন ইলা-ইয়াওমিদ্দীন।

Contents

দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম রিজাল শাস্ত্রবিদ

'আল্লামা আবূ মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন (রহ.)

লিখিত ও অনূদিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহ

০১	আম্মাপারার তরজমা ও ভাষ্য (তাফসীর)	৩০০/-
০২	আমাদের নাবী (সা) ও তাঁর আদর্শ মূল : ইমাম ইবনে কাইয়্যিম (রহ.), সম্পাদনা : আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ	২৮০/-
০৩	রাসূলুল্লাহর (সা) সালাত আকীদা ও জরুরী মাসআলা	২৫০/-
০৪	আর্-রিসালাতুস সানিয়াহ– নামায ও উহার অপরিহার্য করণীয় (অনূদিত) মূল : ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.)	৬০/-
০৫	হাজ্জ উমরাহ ও যিয়ারত (অনূদিত) মূল ঃ আল্লামা আব্দুল্লাহ বিন বায (রহ.)	১২০/-
০৬	ইসলামে বিভিন্ন দল ও উহার উৎস	১০০/-
০৭	মুসলিম জাতির কেন্দ্রবিন্দু : তাওহীদের তত্ত্ব ও সুন্নাহ্র গুরুত্ব	৬০/-
০৮	মৃতদের জন্য জীবিতদের করণীয়	৮০/-
০৯	হাকীকাতুস সালাত (ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহার কিরাআত)	৪৫/-
১০	ইসলাম ও তাসাওউফ	৬০/-
১১	কিতাবুদ্ দু'আ (শুদ্ধভাবে সালাত ও দৈনন্দিন অপরিহার্য দু'আসমূহ) [তাহকীক ও তাখরীজসহ] সম্পাদনা : আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ	১৫০/-
১২	খুৎবাতুত্ তাওহীদ ওয়াস্ সুন্নাহ	১২০/-
১৩	অসূলে দীন (দীনের মৌলিক বিষয়সমূহ)	৮০/-
১৪	সূরা মুল্ক-এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা	৩২/-
১৫	ইসলাম ও অর্থনীতি (বিশ্লেষণ ও সমাধান)	৬৫/-
১৬	ধর্ম ও রাজনীতি	৬০/-
১৭	মুসলিম বিশ্বে ইয়াহূদী চক্রান্ত ও সমাজতন্ত্রের রূপরেখা সম্পাদনা : আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ	৩০/-
১৮	নতুন চাঁদ (বিভিন্ন দেশে চাঁদ উদয়ের তারতম্যের সমাধান)	১০/-
১৯	ইসলামের নামে সন্ত্রাস সম্পাদনা : আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ	২০/-
২০	মতবাদ ও সমাধান	৫০/-
২১	শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) [কর্মময় জীবন ও সংস্কার] সম্পাদনা : আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ	১৫০/-
২২	ঈমান ও আকীদা [মূল : হাফিয শাইখ আইনুল বারী আলিয়াভী]	১০০/-
২৩	সিয়াম ও রামাযান [মূল : হাফিয শাইখ আইনুল বারী আলিয়াভী]	১৩০/-
২৪	মহান স্রষ্টার অপরূপ সৃষ্টি প্রফেসর এ এইচ এম শামসুর রহমান	৩০০/-
২৫	মুসলিম বিশ্বে অমুসলিমদের অধিকার প্রফেসর ড. সালেহ্ হোসাইন আল-আয়েদ (সউদী আরব)	৮০/-
২৬	ইসলামী পানাহার ও আতিথেয়তা	৪০/-
২৭	হৃদয় সম্প্রসারণ (ইমাম মুহাম্মদ বিন 'আলী আশ-শাওকানী (রহ.)	৮০/-
২৮	বিদ'আত ঃ ভয়াবহ (প্রফেসর এ.এইচ.এম শামসুর রহমান)	৮০/-
২৯	ইত্তিবা'য়ে সুন্নাত [মূল : আল্লামা আবদুল্লাহ বিন বায (রহ.) সউদী আরব]	৬০/-
৩০	ঈদুল আয্হা ও কুরবানী [মূল : হাফিয শাইখ আইনুল বারী আলিয়াভী]	---

আল্লামা 'আলীমুদ্দীন একাডেমী

৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০

ফোন ও ফ্যাক্স : ৮৮০২-৮১২৫৮৮৮, মোবাইল : ০১৭২৬-৬৪৪০৬৭, ০১৭১২-৮৮৯৯৮০